রামায়ণী কথামৃত

শ্রীহিরণপ্রভা সেন
কর্তৃক পরিমার্জিত

শ্রীসুপ্রিয়া সেন
কর্তৃক রচিত

প্রাপ্তিস্থান :
ইউ. এন. ধর য়্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
সারস্বত পরিষদ
২ ভবানী দত্ত লেন
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর
শ্রীঅসিতকুমার ঘোষ
দি মুকুল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

মূল্য দেড় টাকা মাত্র
প্রাইজ সংস্করণ—সাত সিকা

প্রস্তাবনা

স্বল্প-শিক্ষিতের উপযোগী রামায়ণের সংক্ষেপিত সংস্করণ অনেক আছে। এ সব সংস্করণে মূল কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে বলা আছে। কিন্তু "রামায়ণী-কথামৃত" বইখানিতে গতানুগতিক পন্থায় মূল কাহিনী বলা হয় নি। কতকগুলি শিক্ষাপ্রদ সুন্দর সুন্দর কাহিনীর মাধ্যমে রামায়ণের মূল কাহিনী স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে রচিত উক্ত বইখানি স্বল্পশিক্ষিতদের মনে শুধু কৌতূহল জাগ্রত করেই ক্ষান্ত থাকবে না,—তাদের কাছে সৎশিক্ষার সঙ্গে অবসর-যাপনের সুযোগ এনে দেবে। তারা যদি এই পুস্তিকা পাঠ করে মূল কাহিনীটির সন্ধান করতে পারে, তাহলে পরিশ্রম সফল হয়েছে বলে মনে করব। ইতি,

সারস্বত পরিষদ

সূচীপত্র

রামায়ণী কথামৃত

••••••●●●●•••••

বাল্মীকি ও নারদ

[সকাল বেলা। স্নানের জন্য বনের পথে তমসা নদীর দিকে চলেছেন মহর্ষি বাল্মীকি। সঙ্গে আছেন শিষ্য ভরদ্বাজ।]

বাল্মীকি—(ভরদ্বাজের দিকে চেয়ে) ভরদ্বাজ, দেখ, কেমন সুন্দর তমসা নদী। এর জলে স্নান করলে সব পাপ ধুয়ে মুছে যায়। মন হয় তৃপ্ত, শান্ত। তুমি হাতের কলস রেখে দাও। দাও আমার পরবার বাকল। আমি স্নান করব।

ভরদ্বাজ—(বাকল এগিয়ে দিয়ে) গুরুদেব, আজ দেবর্ষি নারদ আপনার কাছে এসেছিলেন, দেখেছি।

বাল্মীকি—দেবর্ষি আমাকে বড় গুরু ভার দিয়ে গেলেন। রামচন্দ্রের জীবন নিয়ে আমায় লিখতে হবে কাব্য।

ভরদ্বাজ—আমরা বনবাসী তপস্বী। সংসারের সংবাদ আমরা রাখি না, রামচন্দ্রের চরিত-কথা আমাদের জানা নেই।

বাল্মীকি—দেবর্ষি সংক্ষেপে রামচন্দ্রের জীবন-কথা বলে গেছেন। তিনি এখনো বেঁচে আছেন।

ভরদ্বাজ—রামচন্দ্রের জীবন-কথা শোনবার জন্য আমার কৌতূহল হচ্ছে, গুরুদেব।

বাল্মীকি—সবগুণের আধার ইক্ষ্বাকু বংশের এই রাজা রামচন্দ্র। তিন-ভুবনে বর্তমানে তাঁর সমতুল্য আর কেউ নেই। মহারাজ দশরথের চার ছেলের মধ্যে তিনি বড়। যখন তাঁর যুবরাজ হবার সময় এল, তখন তিনি সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে পিতার সত্যপালনের জন্য বনে গেলেন। পুত্রশোকে দশরথের মৃত্যু হ'ল। সীতা আর লক্ষ্মণকে নিয়ে রামচন্দ্র এলেন দণ্ডকারণ্যে। দণ্ডকারণ্যের জনস্থানে তিনি রাবণের বোন শূর্পণখার নাক-কান কেটে দেন। কারণ, সে রামলক্ষ্মণকে বিয়ে করতে চেয়েছিল এবং সীতাকে মেরে ফেলতে গিয়েছিল। এতে লঙ্কার রাজা রাবণ রেগে গিয়ে সীতাকে হরণ করেন। বানর সৈন্যের সাহায্যে সাগরে সেতু বেঁধে রামচন্দ্র লঙ্কা আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে রাবণ সবংশে নিহত হয়। সীতার উদ্ধারের পর রামচন্দ্র তাঁকে অগ্নি-পরীক্ষায় শুদ্ধ করে আবার অযোধ্যায় ফিরে এলেন। বসলেন অযোধ্যার সিংহাসনে। এখন তিনি অযোধ্যার রাজা।

ভরদ্বাজ—গুরুদেব, জীবিত লোকের জীবন-কথা তো সম্পূর্ণ নয়।

বাল্মীকি—তা নয়। তাঁর পরবর্তী জীবন-সম্বন্ধেও দেবর্ষি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তার রাজত্বকালে রাজ্যের প্রজারা হবে ধর্মপরায়ণ। তারা সুখে শান্তিতে থাকবে।

[বাল্মীকি কথা বলতে বলতে অগ্রসর হচ্ছেন। পেছনে পেছনে কলস হাতে ভরদ্বাজ গুরুদেবের অনুসরণ করে চলেছেন।]

ভরদ্বাজ—[হঠাৎ চমকে] কি করুণ রব শুনতে পাচ্ছি, গুরুদেব।

বাল্মীকি—[চলতে চলতে থেমে গিয়ে] তাই তো! পাখীর কান্না বলে মনে হচ্ছে, চল, এগিয়ে দেখি।

[দু'জনেই তাড়াতাড়ি বনপথে এগিয়ে গেলেন]

ভরদ্বাজ—গুরুদেব, ওই দেখুন এক ব্যাধ এগিয়ে আসছে।

[ধীরে ধীরে এক ব্যাধেব প্রবেশ। হাতে তার তীরধনু।]

ব্যাধ—(ভরদ্বাজকে) পথে একটা পাখী দেখেছেন?

ভরদ্বাজ—পাখী? তুমি কি তাকে তীর দিয়ে মেরেছ?

ব্যধ—দুটি পাখী গাছের ডালে বসে খেলা করছিল। একটির দিকে তীর ছুঁড়ি! আমার মনে হয় তীর পাখীর বুকে বিঁধেছে। পালাতে পারেনি।

ভরদ্বাজ—তুমি কেন এ অন্যায় কাজ করলে? জান, এটা তীর্থস্থান। তীর্থস্থানে হিংসা নিষিদ্ধ, আর তাছাড়া যে কোন প্রাণিহত্যাই পাপ।

ব্যাধ—ঠাকুর, আপনি কে তা আমি জানি না। আমার জীবনধারণের জন্য যে কাজ, তাই আমি আমার ধর্ম বলে মনে করি।

ভরদ্বাজ—তা বলে হিংসা ধর্ম নয়! তুমি মহাপাপী।

[খানিক দূর এগিয়েই মহর্ষি দেখতে পেলেন এক ক্রৌঞ্চ (কোঁচ বক) মাটিতে পড়ে আছে। রক্তে ভিজে গেছে

মাটি, আর ক্রৌঞ্চী তার রক্তমাখা মৃত সাথীর চারদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর কাঁদছে।]

ব্যাধ—[তাড়াতাড়ি মরা পাখীর কাছে ছুটে গিয়ে] এই তো আমার পাখী। আজ আর অনাহারে থাকতে হবে না।

বাল্মীকি—[কিছুক্ষণ দুঃখে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে] আমি সংসার-বিরাগী তপস্বী। সংসারের স্নেহ, মায়া, মমতা আমাকে বেঁধে রাখতে পারে নি। আমি জানতাম আমার মন দুঃখশোকের অতীত। কিন্তু আমার ভুল ধারণা। বৃথা আমার তপস্যা। আমার সমস্ত অন্তর কেঁদে উঠেছে এই নিষ্ঠুর দৃশ্যে। ভরদ্বাজ, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। ব্যাধকে আমার কাছ থেকে সরে যেতে বল।

ব্যাধ—ঠাকুর, পাখীটা আমি নিয়ে যাই। গত কাল কোন শিকার পাইনি। ভগবান্ আজ আমার আহার্য জুটিয়ে দিয়েছেন।

বাল্মীকি—[রাগে জ্বলে উঠে] ব্যাধ,

কেলি-মত্ত ক্রৌঞ্চ নহেক বধ্য, হনন করিলি ওরে।
জন্মজন্মান্তরে হবে না মুক্তি, শাপ দিনু আমি তোরে।

[ব্যাধ চলে গেল]

ভরদ্বাজ—গুরুদেব, গুরুদেব। এ কি মধুর ছন্দ আপনার কণ্ঠে! এমন সুললিত বাণী তো কখনো কোথাও শুনিনি।

বাল্মীকি—আমি অবাক হচ্ছি, ভরদ্বাজ। আশ্চর্য, অদ্ভুত এই ছন্দোময় বাক্য! এতে রয়েছে গানের সুর। বীণা বাজিয়ে গান করা যায়। গভীর শোক থেকে এর উৎপত্তি বলে আমি এই ছন্দে গাথা সমান-অক্ষর-যুক্ত বাক্যের নাম দিলাম ‘শ্লোক’।

ভরদ্বাজ—গুরুদেব, আপনি ঠিকই বলেছেন। শ্লোকই হবে এই ছন্দে-গাঁথা বাক্যের যথার্থ পরিচয়। পৃথিবীর প্রথম কবিতা বলে এর হবে খ্যাতি।

বাল্মীকি—(মনে মনে)

কেলি-মত্ত ক্রৌঞ্চ নহেক বধ্য,
হনন করিলি ওরে,
জন্মজন্মান্তরে হবে না মুক্তি
শাপ দিনু আমি তোরে…

ভরদ্বাজ—গুরুদেব, গুরুদেব, আপনার স্নানের সময় উত্তীর্ণ। হোমের সময় হয়ে এল।

[আপন মনে বারে বারে শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে মহর্ষি বাল্মীকি এসে দাঁড়ালেন তমসার তীরে।]

বাল্মীকি—চল।

ভরদ্বাজ—গুরুদেব, সকাল বেলার সূর্য ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এবার আকাশের ওপরের দিকে উঠতে থাকবে। আপনি স্নান শেষ করুন।

[বাল্মীকি স্নান শেষ করে ভরদ্বাজের সঙ্গে আশ্রমে ফিরছেন।]

বাল্মীকি—ভরদ্বাজ, দেবর্ষি নারদ রামচন্দ্রের জীবন-কথা রচনা করবার জন্য আমায় আদেশ দিয়েছেন। আমার মনে হয়, এই ধরণের শ্লোকের পর শ্লোক দিয়ে আমি রামচন্দ্রের চরিত-কথা বর্ণনা করে যেতে পারি, লিখতে পারি এক মহাকাব্য।

[এমন সময় আশ্রমে এলেন স্বয়ং ব্রহ্মা।]

ব্রহ্মা—মহর্ষি বাল্মীকি, শ্লোকের পর শ্লোক গেঁথেই তোমাকে সমগ্র রামচরিত লিখতে হবে।

বাল্মীকি—[প্রজাপতিকে প্রণাম করে) প্রজাপতি, আজ আমার মুখ থেকে বার হয়েছে এক অপূর্ব শ্লোক।

ব্রহ্মা—জানি। আমার ইচ্ছাতেই তোমার মুখে এই শ্লোকর প্রকাশ। এবার তুমি রামচন্দ্রের জীবন-কথা লিখতে আরম্ভ কর। নারদের কাছে যেমন শুনেছ, সে-ভাবে রাম-লক্ষ্মণাদির বৃত্তান্ত রচনা কর।

বাল্মীকি—প্রজাপতি, আমি তো সব কথা জানি না।

ব্রহ্মা—মহর্ষি, আমি বর দিচ্ছি, যা তুমি জানো না, ধ্যানে বসে তা তুমি জানতে পারবে। তোমার রচিত রামচন্দ্রের জীবন-কথার নাম হবে 'রামায়ণ'। রামায়ণের কোন বাক্যই মিথ্যা হবে না। রামায়ণ হবে মহাকাব্য! যতকাল পৃথিবীতে থাকবে পাহাড়, পর্বত, নদনদী, ততকাল রামায়ণী কথার প্রচার থাকবে। আর যত কাল পৃথিবীতে রামায়ণী কথার প্রচার থাকবে,

ততকাল তোমার কীর্তিও থাকবে প্রতিষ্ঠিত। তুমি হবে ত্রেতাযুগের মহাকবি।

বাল্মীকি—প্রজাপতি, রামায়ণ রচনা করতে তো শ্লোকের দরকার হবে। আমার মুখ দিয়ে বার হয়েছে তো মাত্র একটি শ্লোক।

ব্রহ্মা—মহর্ষি, বাঁধ যখন ভাঙে, তখন বন্যার গতি হয় অবিরাম। তোমার অন্তরে যে কাব্যের উৎস ছিল রুদ্ধ, আজ তার হয়েছে মুক্তি। তোমার কবিতার ধারাও এবার থেকে অবিরল গতিতে বয়ে চলবে। শ্লোকের পর শ্লোকে রচিত হবে অতুলনীয় মহাকাব্য। আমি তোমাকে আমার আশীর্বাদ জানাই।

[ব্রহ্মা চলে গেলেন।]

বাল্মীকি—ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজ!

ভরদ্বাজ—গুরুদেব!

বাল্মীকি—আমার জপের আসন নিয়ে এস। নিয়ে এস ভূর্জ-পত্র আর লেখনী। আমি আজ থেকেই রামায়ণ-রচনা আরম্ভ করব। কবিতার রসে আমার অন্তর হয়েছে ভরপূর।

[ভরদ্বাজের দেওয়া আসনে বসলেন মহর্ষি বাল্মীকি। হলেন ধ্যানস্থ। অনেকক্ষণ পরে চোখ খুললেন।]

বাল্মীকি—ভরদ্বাজ, রামচন্দ্রের জীবনের সব ছবি আমি দেখতে পেয়েছি, জানতে পেরেছি, তাঁর জীবনে শেষ পর্যন্ত যা ঘটবে। আমি এবার রচনা আরম্ভ করব।

১। দেবর্ষি বলে গেলেন রামচন্দ্রের জীবন-কথা লিখতে।

২। ···তাইত, ব্যাধকে তিরস্কার করতে গিয়ে একি ছন্দোময় বাক্য !

৩। ব্রহ্মা বললেন, আমার ইচ্ছাতেই তোমার মুখে এই শ্লোক···

৪। এবার যোগাসনে বসলেন মহর্ষি। আরম্ভ করবেন রচনা।

[যোগাসনে বসলেন মহর্ষি। আরম্ভ করবেন রচনা। সময় কেটে যেতে লাগল। কেটে যেতে লাগল দিনের পর দিন, বছরের পর। তার পরে একদিন মহাকাব্য সমাপ্ত হ'ল। তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন মহর্ষি। ডাকলেন শিষ্যকে। ভরদ্বাজ এসে দাঁড়ালেন।]

ভরদ্বাজ—আপনার মহাকাব্য শেষ হ'ল, গুরুদেব?

বাল্মীকি—ভরদ্বাজ, আমার কর্তব্য আমি শেষ করেছি। চব্বিশ হাজার শ্লোকে, পাঁচিশ স্বর্গে আর ছয় কাণ্ডে উত্তর-কাণ্ড সহ রামায়ণ হ'ল সমাপ্ত। এখন এর প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এখন গানে গানে রামায়ণ প্রচার করার প্রয়োজন।

ভরদ্বাজ—গুরুদেব, আপনি রামচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবন-সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা-ই সত্য হ'ল। হ'ল সীতার নির্বাসন। আপনার আশ্রমে তিনি পেলেন আশ্রয়। সীতার দু' ছেলে লব আর কুশ। তারাই গাইবে এ গান। আর রামচন্দ্র শীঘ্রই রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করবেন। তখন যজ্ঞসভায় রামায়ণ-গান গাইলে দেশে দেশে হবে এর প্রচার।

বাল্মীকি—ঠিক বলেছ, ভরদ্বাজ। লবকুশকে ডেকে পাঠাও, আমি আজ থেকেই তাদের রামায়ণ-গান শিক্ষা দেব।

[ভরদ্বাজ চলে গেল।]

দশরথ ও অন্ধমুনি

অযোধ্যার যুবরাজ দশরথ। তিনি চলেছেন মৃগয়ায়। বর্ষাকাল। আকাশে মেঘ। মাঝে মাঝে পড়ছে বৃষ্টি। দিনের বেলায়ও অন্ধকার। কাদা-জলে পথচলা সহজ নয়। কোন মতে রথ চলছে। তবুও তিনি শিকারের নেশা ত্যাগ করতে পারলেন না।

সেদিন আরও দুর্যোগ। অনবরত পড়ছে বৃষ্টি। আকাশে বজ্রের গর্জন। বিদ্যুতের চমক। জোরে বইছে বাতাস। দুলছে গাছগাছালি।

সরযূ-তীরের গভীর বনে প্রবেশ করলেন যুবরাজ। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। ভাল করে কিছুই দেখা যায় না।

রথ আরও এগিয়ে চলেছে। যুবরাজের কোন ভয় নেই। শিকারের নামে তিনি মেতে ওঠেন। কোন বাধা তিনি মানেন না। সীমাহীন তাঁর সাহস। শিকার লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লে, তা কখনো ব্যর্থ হয় না। শুধু তাই নয়। কেবল শব্দ শুনেই তিনি লক্ষ্যে তীর বিঁধতে পারেন। এজন্যে তাঁর নাম হয়েছিল শব্দবেধী।

চলতে চলতে এক জায়গায় এসে রথ থামল। খানিক দূরেই সরযূ নদী। বাতাসে জলে উঠছে ঢেউ। ঢেউ তীরে এসে ভেঙে পড়ছে। উঠছে বিচিত্র শব্দ। হঠাৎ তিনি আর

এক রকম শব্দ শুনতে পেলেন। ঠিক ঢেউ-এর শব্দ নয়। মনে হয়, কে যেন কলসে জল ভরছে।

কিন্তু এ দুর্যোগে কে আসবে নদীতে জল নিতে ?

কান পেতে ভাল করে যুবরাজ শব্দটা আবার শুনতে লাগলেন। কলকল ছলছল শব্দ। মনে হয়, একটা বুনো হাতী যেন নদীর জল পান করছে।

দশরথ মনে ভাবলেন, হাতীই হবে। কোন লোক নয়। তিনি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। পিঠে ছিল তীরভরা তূণ। তিনি একটি তীর বেছে নিলেন। ধনুকে বসিয়ে অন্ধকারেই শব্দ লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কানে এল কিশোর-কণ্ঠের করুণ চিৎকার ! দশরথ থমকে দাঁড়ালেন। মুহূর্তমাত্র। তারপর তিনি শব্দ অনুসরণ করে ছুটে চললেন।

কাছে এসে তিনি দেখলেন, এক কিশোর বালক মাটিতে পড়ে আছে। বুকে তীর বিঁধে আছে। তাঁরই ছোঁড়া তীর। রক্তে বুক ভেসে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় সে ছট্‌ফট্‌ করছে।

দশরথ বালকের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে ?

অতি কষ্টে বালক উত্তর দিল, আমার নাম সিন্ধু। আমি অন্ধমুনির ছেলে। আমার বাবা-মা দু'জনেই অন্ধ। আমার মৃত্যুর আর বেশি দেরি নেই। কিন্তু আমি না থাকলে আমার মা-বাবার কি হবে ? কে তাদের দেখবে ?

দশরথ আবার প্রশ্ন করলেন, এই দুর্যোগে তুমি জল নিতে এসেছিলে কেন?

যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে সিন্ধু উত্তর দিল, ঘরে এক ফোঁটা জলও ছিল না। মা-বাবার পিপাসার জল নেবার জন্য আমি নদীতে এসেছিলাম। কিন্তু তাঁদের পিপাসা মেটাতে পারলাম না। আমার প্রাণ গেল। আর আমার শোকে এবার তাঁদেরও মৃত্যু হবে।

সিন্ধু চুপ করল।

দশরথ এ করুণ দৃশ্য আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি মুনি-কুমারকে বুকে তুলে নিলেন। মুনি-কুমারের রক্তে তাঁর পোশাক ভিজে গেল।

শিকার করতে এসে এমন বিপদে তিনি আর কোন দিন পড়েন নি। তিনি হরিণ মেরেছেন, বাঘ, সিংহ, বুনো হাতী, বুনো শূকরও মেরেছেন। এদের হত্যায় তাঁর মনে কোন দুঃখ হয় নি। হয় নি কোন অনুতাপ। কিন্তু মানুষ-হত্যা! শিকার করতে এসে মানুষ-হত্যা তাঁর এই প্রথম। শুধু মানুষ নয়, তিনি করেছেন ব্রাহ্মণ-হত্যা।

দশরথ মনে মনে শিউরে উঠলেন, তিনি বুঝলেন, মুনি-কুমারের মৃত্যুর আর বিলম্ব নেই। বুকের তীর টেনে তুললেই তার জীবন হবে শেষ। কিন্তু তিনি কিশোর মুনি-কুমারের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারলেন না। এক টানে তিনি তীর তুলে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধুর শেষ নিশ্বাস বার হয়ে গেল।

স্তম্ভিতের মত কিশোরের মৃতদেহ বুকে করে বনের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলেন যুবরাজ দশরথ।

কড়্ কড়্ শব্দে বজ্রপাত হ'ল। মনে হ'ল, হঠাৎ আকাশ যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেছে!

মৃতদেহ বুকে করে দশরথ ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন অন্ধমুনির আশ্রমের দিকে।

আশ্রমের দুয়ারে বসেছিলেন অন্ধমুনি আর তাঁর পত্নী। দু'জনেই অন্ধ। কিছুই দেখতে পান না। কিন্তু কান বড় সজাগ। দশরথের পায়ের শব্দ দু'জনেই শুনতে পেলেন।

অন্ধমুনি ডাকলেন, বাবা সিন্ধু এলে? বড় পিপাসা! দাও, জল দাও, বাবা!

কোন উত্তর এল না ছেলের কাছ থেকে।

এবার মা বললেন, বাবা, পিপাসা পেয়েছে···জল দাও!

দশরথ কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। তিনি কেমন করে মা-বাবার কাছে ছেলের মৃত্যু-সংবাদ দেবেন?

অন্ধমুনি আবার বললেন, কথা বলছ না কেন, বাবা? দাও, জল দাও, আমাদের দু'জনেরই বড় পিপাসা···

দশরথ ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে সিন্ধুর মৃতদেহ নামিয়ে রাখলেন মাটিতে। তারপর বললেন, মুনিবর, আমি আপনার ছেলে নই? আমি যুবরাজ দশরথ।

অন্ধমুনি প্রশ্ন করলেন, তুমি এ সময়ে এখানে কেন? আমার ছেলে কই?

দশরথ উত্তর দিলেন, মুনিবর, না জেনে আমি আপনার ছেলেকে বধ করেছি। আমি না জেনে যে অপরাধ করেছি, তার শাস্তি নেবার জন্য আমি প্রস্তুত!

বজ্রাহতের মত বসে রইলেন মুনি-দম্পতি। তাঁদের যেন মনে হ'ল দশরথের কথা সত্য নয়। ছেলে তাঁদের পিপাসার জল আনতে গিয়েছে, এখনি সে ফিরে আসবে।

কোন কথা তাঁরা বলতে পারলেন না।

দশরথ ধীরে ধীরে সব ঘটনা বলে গেলেন। নিস্তব্ধ হয়ে শুনলেন অন্ধমুনি।

নিজের শোক সংযত করে তিনি হাত দিলেন মৃত ছেলের দেহে। মা এসে মরা ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বসলেন।

অন্ধমুনি দশরথকে সম্বোধন করে বললেন, যুবরাজ, তোমার ভাগ্য ভালো যে তুমি ব্রহ্মহত্যা কর নি।

দশরথ চমকে উঠলেন, প্রশ্ন করলেন, তবে সিন্ধু কি আপনার ছেলে নয়?

অন্ধমুনি উত্তর দিলেন, আমি ব্রাহ্মণ নই, বৈশ্য। আর আমার স্ত্রী শূদ্রা। সুতরাং ব্রহ্মহত্যার পাপ তোমার হবে না। কিন্তু আমাদের একমাত্র ছেলেকে হত্যা করবার জন্য তোমাকে দায়ী হতে হবে।

দশরথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

১। মৃগয়ায় এসে, দশরথ অন্ধকারে এক শব্দ শুনে তীর ছুঁড়লেন।

২। অতি কষ্টে সিন্ধু বললে, আমার মা-বাবাব কি হবে ?

৩। অনুতাপে ও ভয়ে, দশরথ মৃতদেহ বুকে করে এগোতে লাগলেন।

৪। অন্ধমুনি বললেন, পুত্রশোকে আমাদের যে দশা হ'ল, তোমারও……

অন্ধমুনি বললেন, যুবরাজ, আমাদের বেঁচে থেকে আর লাভ নেই। আমরাও পুত্রের চিতায় পুড়ে মরব। আমি তোমাদের শাপ দিচ্ছি, আমাদের যেমন পুত্রশোকে মৃত্যু হ'ল, তোমারও তেমনি মৃত্যু হবে পুত্রশোকে। পাপ পাপ। পাপ না জেনে করলেও পাপের ফল ভোগ করতে হয়। জেনে বা না জেনে আগুনে হাতে দিলে হাত পুড়ে যায়। আগুন ক্ষমা করে না।

এই বলে অন্ধমুনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর আদেশে দশরথ চিতা প্রস্তুত করলেন। চিতায় আগুন দেওয়া হ'ল।

অন্ধমুনি বললেন, সিন্ধু, তুমি কোন দিন কোন পাপ করনি। তুমি এবার পুণ্যলোকে যাও।

মুনিকুমার দিব্যদেহে স্বর্গে গমন করল।

তারপর আবার চিতায় নতুন করে আগুন দেওয়া হ'ল। স্বামি-স্ত্রী উঠলেন সে চিতায়।

আগুন জ্বলে উঠল। আগুনের শিখা উঠল আকাশে।

দশরথ দেখলেন, জ্যোতির্ময়-রূপে স্বর্গে যাচ্ছেন অন্ধ মুনিদম্পতি।

বিষণ্নমনে যুবরাজ অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

—o—

কৈকেয়ী ও মন্থরা

[রাজা দশরথের অন্তঃপুর। রাজার মেজ রানী কৈকেয়ী। তিনি নিজের ঘরে একটি সুন্দর আসনে বসে আছেন। এমন সময় ঘরে প্রবেশ করল তাঁর মন্থরা দাসী।]

কৈকেয়ী—মন্থরা, তোমার মুখভার দেখছি কেন ?

মন্থরা—সব দিনই কি রানী-মা, সকলের মেজাজ ভাল থাকে ?

কৈকেয়ী—এই খানিকক্ষণ আগেই তো তোমাকে হাসিখুশি দেখেছি। হঠাৎ তোমার কি হ'ল ?

মন্থরা—রাজধানীর খবর আপনি শোনেন নি, রানী-মা ?

কৈকেয়ী—রাজধানীর আবার কি খবর ? তাতে আমার দরকারই বা কি ?

মন্থরা—(আশ্চর্য হয়ে) দরকার-অদরকারের কথা নয়, রানী-মা। সবাই যে খবর জানে, তা আপনি জানেন না ?

কৈকেয়ী—না। [এমন সময় আর একজন দাসী এসে দাঁড়াল।]

দাসী—রানী-মা, বড় রানী-মা আপনাকে ডাকছেন।

কৈকেয়ী—(আসন থেকে উঠে) মন্থরা, তুমি একটু দাঁড়াও। আমি বড় দিদির কাছ থেকে এখনি আসছি।

[কৈকেয়ী চলে গেলেন]

মন্থরা—(নিজে নিজেই বলতে লাগল) বুঝেছি, কেন বড় রানী-মা ডেকেছেন। তাঁর তো আহ্লাদের আর সীমা নেই। তাঁর ছেলে রাম হচ্ছেন যুবরাজ। এক কথাটা

জানাতেই তিনি ঠাকুরানীকে ডেকে পাঠালেন, আর আমার ঠাকুরানী হয়ত সংবাদ শুনে আহ্লাদে ডগমগ হয়ে ফিরে আসবেন। চাই কি, আমাদের দেবেন অনেক উপহার। কিন্তু...

[ভরত প্রবেশ করলেন]

ভরত—মা কোথায়, মন্থরা ?

মন্থরা—তাঁকে বড় রানী-মা ডেকে পাঠিয়েছেন।

ভরত—মন্থরা, আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। দাদা হচ্ছেন যুবরাজ। আগামী কাল হবে তাঁর অভিষেক।

মন্থরা—কেন, তুমি যুবরাজ হতে পার না ?

ভরত—(আশ্চর্য হয়ে) রাজার বড় ছেলে হবে যুবরাজ, এই তো নিয়ম। তুমি এ কথা বলছ কেন, মন্থরা ?

মন্থরা—না। আমি এমনি জিজ্ঞেস করেছি।

ভরত—আমি যুবরাজ হলে তুমি বুঝি খুব খুশি হতে, মন্থরা ? আমি কিন্তু খুশি হতাম না। দাদা আমাদের চেয়ে সব বিষয়েই বড়। রূপে, গুণে, জ্ঞানে, বীরত্বে, দয়ায়, ধর্মে তাঁর তুলনা নেই। তিনি মানুষ নন, দেবতা। আমরা ভায়েরা তাঁর সেবা করবার অধিকার পাব। এ তো আমাদের ভাগ্য।

[কৈকেয়ী হাসিমুখে প্রবেশ করলেন। ভরত মাকে প্রণাম করল।]

কৈকেয়ী—এইমাত্র বড় দিদি আমাকে বললেন, রাম হচ্ছেন যুবরাজ। তুই শুনিস নি কিছু ?

ভরত—মা, এই সংবাদ দিতেই তো আমি এসেছিলাম।

কৈকেয়ী—বড় ছেলে বলে নয়, মহারাজ যোগ্য পাত্রকেই যুবরাজ করেছেন। যা তুই, দাদাকে প্রণাম করে আয়। আর, আমার কাছেও তাঁকে পাঠিয়ে দিবি। আমি তাঁকে আশীর্বাদ করব।

[ভরত চলে গেলেন।]

মন্থরা—ঠাকুরানী, আপনি তো আশীর্বাদ করতে রামচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু রামচন্দ্র যদি যুবরাজ হন, তা হলে আপনার ছেলে ভরতের কি দশা হবে।

কৈকেয়ী—তোর কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। রামচন্দ্র যুবরাজ না হন, এই কি তোর ইচ্ছে ? এই যদি তোর মনের ইচ্ছে হয়, তাহলে মনের ইচ্ছে মনেই রাখবি, কোনদিন মুখে উচ্চারণ করবি না। ভরতের মতই রাম আমার ছেলে। আমি ভরতকে যেমন ভালবাসি, রামকেও আমি ঠিক তেমনি ভালবাসি। তাই এই সংবাদ শুনে আমারও আনন্দের সীমা নেই।

মন্থরা—ভাল কথা। কিন্তু ঠাকুরানী, ভরতের সম্বন্ধে আমি যে প্রশ্ন করেছি, তার উত্তর তো আপনি দেন নি। মহারাজের পর রামচন্দ্রই হবে অযোধ্যার রাজা, ভরত নয়। তাই জিজ্ঞেস করি, এই কি আপনার আনন্দের দিন ? অযোধ্যার যুবরাজই অযোধ্যার ভাবী রাজা। ভেবে দেখুন, তাঁর

খ্যাতির কথা, ক্ষমতার কথা। অযোধ্যার সমস্ত প্রজা মাথা নিচু করে তাঁকে প্রণাম করবে, রাজ-কর্মচারীরা হবে তাঁর বাধ্য। রাজভাণ্ডারের সমস্ত ঐশ্বর্যের তিনি হবেন প্রভু। সবাই জয়ধ্বনি করবে বড় রানী কৌশল্যার। আজ তিনি পাট-রানী। কাল হবেন তিনি রাজমাতা। কৈকেয়ীর দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না। তাঁর স্থান হবে অন্তঃপুরের এক কোণে। আর, রামচন্দ্রের সেবা করে ভরতকে চিরজীবন কাটাতে হবে। সতীন আর সতীনের ছেলের ওপর যাঁর এমন সোহাগ, তাঁকে আর যাই বলা যাক্, বুদ্ধিমতী বলা চলে না।

কৈকেয়ী—এ কি বলছিস, মন্থরা ? তোর সাহস তো কম নয়।

মন্থরা—আমার যে সাহস আছে, তা আপনার নেই, ঠাকুরানী। নিজের ভাল যে না চায়, তার ভাল কেউ করতে পারে না। ভরতের যুবরাজ হতে বাধা কি ?

কৈকেয়ী—বাধা মহারাজ, বাধা শাস্ত্র আর দেশের প্রথা। ভরতের যুবরাজ হওয়া সম্ভব নয়। হতে পারে না। তুই কুটিল, কুচক্রী। আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যা।

মন্থরা—ঠাকুরানী, ন্যায়, নীতি, ধর্ম বাদ দিয়ে আমি কোন কথা বলছি না। ন্যায়, নীতি, ধর্ম বজায় রেখে যদি ভরত যুবরাজ হতে পারে, তা হলে ?

কৈকেয়ী—মা ছেলেকে বড় করতে চায়, বড় দেখতে চায়।

আমিও তাই চাই। কিন্তু অন্যায় পথে চলে আমি আমার ছেলেকে বড় করতে চাই না। তা সম্ভবও নয়। তুই অন্য কথা বল্, মন্থরা। আমাকে দুর্বল করিস্ নে। এ হয় না।

মন্থরা—ঠাকুরানী, আমি আপনাকে অন্যায় কাজ করতে বলছি, এই বা আপনি ভাবলেন কি করে? ভরত যুবরাজ হয়, রাজা হয়, এ কি আপনি চান না?

কৈকেয়ী—চাই, মন্থরা, চাই। কিন্তু এ যে স্বপ্ন!

মন্থরা—ঠাকুরানী, স্বপ্নকেই আপনি ইচ্ছে করলে সত্য করে তুলতে পারেন। সেই সুযোগ এসেছে। এ সুযোগ আপনি হেলায় হারাবেন না।

কৈকেয়ী—মহারাজ ঘোষণা করেছেন, রামচন্দ্র হবেন যুবরাজ। অভিষেকের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। এসেছেন গুরু-পুরোহিত। এসেছেন মুনি-ঋষিগণ। এসেছেন রাজ-রাজড়ারা। সমাগত ব্রাহ্মণগণ। সমস্ত অযোধ্যা উৎসবে মত্ত। মহারাজকে আমি ভরতের কথা বলব কি করে?

মন্থরা—ঠাকুরানী, মনে আছে, রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে একবার মহারাজ ক্ষতবিক্ষত হয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে-ছিলেন। তখন আপনি সেবাযত্ন করে তাঁকে সারিয়ে তোলেন। মহারাজ খুশি হয়ে আপনাকে দু'টি বর দিতে চেয়েছিলেন। তখন সে-বর আপনি নেন নি।

কৈকেয়ী—মনে আছে। মহারাজ বলেছিলেন, যখনি বর দু'টি আমি চাইব, তখনি তিনি আমাকে তা দেবেন। আমার বর চাইবার কোন প্রয়োজন হয় নি।

মন্থরা—এখন বর চাইবার প্রয়োজন এসেছে। সত্যবদ্ধ মহারাজ বর দিতে অরাজী হবেন না।

কৈকেয়ী—কি বর আমি চাইব।

মন্থরা—এক বরে রামচন্দ্র যাবেন চোদ্দ বছরের জন্যে বনে আর এক বরে ভরত হবে যুবরাজ। ঠাকুরানী, এ সুযোগ আপনি ছাড়বেন না। মনে রাখবেন, আপনি মা। ছেলের প্রতি মার কর্তব্য আছে। এ সুযোগ নষ্ট করলে ছেলের দুর্ভাগ্যের জন্য আপনি হবেন দায়ী।

কৈকেয়ী—মন্থরা, তুই সরে যা। আমার সামনে থেকে চলে যা। তোর মুখ আমি দেখতে চাই না।

মন্থরা—ঐ মহারাজ আসছেন। আমি যাই। যাওয়ার আগে আবার বলি, এমন সুযোগ আর আপনার জীবনে আসবে না।

[মন্থরা চলে গেল। প্রবেশ করলেন মহারাজ দশরথ।]

দশরথ—কৈকেয়ী, তোমাকে এমন মলিন দেখছি কেন ?

কৈকেয়ী—মহারাজ !

দশরথ—বস, কৈকেয়ী। আজ এমন আনন্দের দিনে মনমরা হয়ে থাকবে, এ আমি চাই না।

কৈকেয়ী—মহারাজ, আপনার মনে পড়ে, একবার রাক্ষসদের

সঙ্গে যুদ্ধে আপনি ক্ষতবিক্ষত হয়ে ফিরে এসে-
ছিলেন।

দশরথ—খুব মনে পড়ে। তোমারই সেবাযত্নে আমি বেঁচে উঠি।

কৈকেয়ী—আমার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে আপনি আমাকে দু'টি
বর দিতে চেয়েছিলেন।

দশরথ—কৈকেয়ী, মনে আছে। যদি চাও, আজই আমি
তোমাকে সে দু'টি বর দিতে পারি। আজ আমার
অদেয় কিছু নেই।

কৈকেয়ী—আমি বর দু'টি আজই চাই, মহারাজ!

দশরথ—কি তোমার প্রার্থনা?

কৈকেয়ী—আমার প্রার্থনা, আপনি পূরণ করবেন?

দশরথ—সত্য ভঙ্গ করে আমি পাপী হতে চাই না।

কৈকেয়ী—শুনুন তবে মহারাজ, আমার প্রার্থনা। আমি এক বরে
চাই, রাম চোদ্দ বছরের জন্যে বনে যাবে, আর এক
বরে চাই, ভরত হবে অযোধ্যার যুবরাজ।

দশরথ—(চমকে উঠে) এ কি বর চাইলে, কৈকেয়ী। এ
যে আমার মৃত্যুদণ্ড। না, না কৈকেয়ী এ হতে পারে
না। তুমি অন্য বর চাও, আমাকে বাঁচাও। এত
নিষ্ঠুর তুমি হয়ো না।

কৈকেয়ী—সত্যসন্ধ মহারাজ, আমার আর বলবার কিছু নেই।
অন্য বরে আমার কোনই প্রয়োজন নেই। প্রতিজ্ঞা
পালন করা আর না করা আপনার ধর্ম।

১। মন্থরা—এক বরে রামচন্দ্র যাবেন চোদ্দ বছরের জন্যে বনে আর এক বরে ভরত হবে যুবরাজ।

২। কৈকেয়ী—মন্থরা, তুই আমার সামনে থেকে চলে যা।

৩। দশরথ—সত্য ভঙ্গ করে আমি পাপী হতে চাই না।

৪। দশরথ—এ কি বর চাইলে, কৈকেয়ী? এ যে আমার মৃত্যুদণ্ড!

[ম্লানমুখে রাজা দশরথ কৈকেয়ীর ঘর হতে বার হয়ে গেলেন আর হাসিমুখে প্রবেশ করল মন্থরা।]

মন্থরা—ঠাকুরানী, আপনি বড় ক্লান্ত। বিশ্রাম করুন।

কৈকেয়ী—মন্থরা, তুই জিতে গেলি। আমিই হেরে গেলাম। মিথ্যা পুত্রস্নেহের নামে আমি তোর কাছে ছোট হয়ে গেলাম। মায়ের গৌরবের আসন লুটিয়ে গেল ধূলোয়। আমি স্বামী হারালাম, হারালাম পুত্র। অযোধ্যার আমি করলাম সর্বনাশ!

মন্থরা—ঠাকুরানী, ঠাকুরানী!

কৈকেয়ী—কথা বলিস নে, মন্থরা। আমি আজ মহারাজের মুখে দেখেছি মৃত্যুর ছায়া। মনে পড়ছে, অন্ধমুনির শাপের কথা। শব্দভেদী বাণ দিয়ে মহারাজ অজ্ঞাতে তাঁর ছেলেকে মেরে ফেলেছিলেন। মরা ছেলেকে কোলে নিয়ে অন্ধমুনি মহারাজকে শাপ দিয়েছিলেন, পুত্র-শোকে তোমারও হবে মৃত্যু। মুনির শাপ ফলতে আর দেরী নেই, মন্থরা। আমি জানি, রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন করবে। ভরত আর আমার মুখ দেখবে না। আমার অখ্যাতিতে ত্রিভুবন ভরে যাবে। আমার বেঁচে থেকে আর কোন লাভ নেই। মন্থরা, তোর দোষ নেই। দোষ আমার দুর্বলতার, দোষ আমার লোভের, দোষ আমার অদৃষ্টের। তুই এখন চলে যা। আমাকে একটু একা থাকতে দে।

[মন্থরা চলে গেল]

কৌশল্যা ও সুমিত্রা

[কৌশল্যার কক্ষ। ম্লানমুখে তিনি মেঝেতে বসে আছেন। কক্ষে আর কেউ নেই। কক্ষে প্রবেশ করলেন সুমিত্রা।]

সুমিত্রা—দেবি।

কৌশল্যা—কে, সুমিত্রা ?

সুমিত্রা—দেবি, এ কি কথা শুনছি ?

কৌশল্যা—ঠিকই শুনেছ, যে হবে যুবরাজ, সে যাচ্ছে বনে।

সুমিত্রা—আপনি নিষেধ করেন নি কেন ?

কৌশল্যা—নিষেধ ? না নিষেধ করি নি। ছেলেকে জানিয়েছি মায়ের ব্যথা। আমি আর কি করতে পারি, বোন।

সুমিত্রা—দেবি, অনার্যা কৈকেয়ীর এ কোন্ মতি ? সে কি জানে না, কি এর পরিণাম ?

কৌশল্যা—এখন আর সে সব আলোচনায় কোন লাভ নেই। মহারাজ কৈকেয়ীকে দু'টি বর দিতে চেয়েছিলেন। কৈকেয়ী সে বর চেয়েছেন। মহারাজ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে বাধ্য। মহারাজের সত্য রক্ষা করতে হলে রামকে বনে যেতেই হবে। রামও বনে যাবার জন্য প্রস্তুত। রাম যে পথ বেছে নিয়েছে, তাই তো ধর্মের পথ।

সুমিত্রা—দেবি, মা হয়েও আপনি একথা বলছেন ? বন-বাসের কি দুঃখ, তা কি আপনি জানেন ? রাক্ষস

আর হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল ঘন বন। পদে পদে মৃত্যুর ভয়। ক্ষুধার আহার্য নেই, তৃষ্ণার জল নেই, বিশ্রামের স্থান নেই। আপনি মা হয়েও নিজের ছেলেকে ঠেলে দিচ্ছেন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে!

কৌশল্যা—সুমিত্রা, আমাকে তিরস্কার করে লাভ নেই। আমি রামচন্দ্রকে বনে যাবার অনুমতি দিয়েছি। আমার আর কোন উপায় নেই। আমি সব ভাবনা, সব চিন্তা শেষ করে দিয়েছি।

[সীতার প্রবেশ]

সীতা—মা।

কৌশল্যা—সীতা, তুমি আবার আমায় কি বলতে এসেছ?

সীতা—আর্যপুত্রের সঙ্গে আমিও বনে যাব। আপনার অনুমতি প্রার্থনা করি।

কৌশল্যা—তুমি বনে যাবে? কেন? সত্যরক্ষার দায় তো তোমার নেই, মা।

সীতা—মা, আপনি তো আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন পতিই স্ত্রীর পরম গুরু। তাঁর সেবা করাই স্ত্রীর ধর্ম। এই ধর্ম পালন করার জন্য আমি বনে যাব। রাজ-কুমার অনাহারে, অনিদ্রায় বনের পথে পথে ঘুরে বেড়াবেন, আর আমি অযোধ্যার অন্তঃপুরে ভোগ-বিলাসে জীবন কাটাব, এ কথা আমি

ভাবতে পারি না। পতির আশ্রয়ে থাকাই স্ত্রীর একমাত্র কামনা—তা সে আশ্রয় যেখানেই হোক না কেন। ছাড়া স্বামীর ধর্মই স্ত্রীর ধর্ম। সুতরাং স্বামী যে সত্য-ধর্ম পালন করতে বনে যাচ্ছেন, আমাকেও সে ধর্মপালনে অনুমতি দিন।

সুমিত্রা—সীতা, কৈকেয়ী অনার্যা। মহারাজ এই অনার্যার বশীভূত হয়ে আছেন। তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। সুতরাং রামচন্দ্রের বনে যাওয়া উচিত নয়।

সীতা—গুরুজনের কাজের বিচার করার ভার আমার নয়। আমাকে বনে যেতে বাধা দেবেন না।

কৌশল্যা—সীতা, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি, তোমার কল্যাণ হোক। তোমাকে নিষেধ করিবার শক্তি আমার নেই। আমি মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণদের মুখে শুনেছি, যে নারী পতিপ্রাণা, সে চির-দিন সুখে কাল কাটায়। মহাদুঃখের মধ্যেও সে পায় আনন্দ। তুমিও সে আনন্দ লাভ কর, এই আমার কামনা।

সুমিত্রা—দেবি, আমি সামান্য নারী। আপনার মহৎ আদর্শ আমার নয়। সংসারে বাস করতে হলে আর পাঁচ জনের যা জীবনযাত্রা, তাই আমাদের মেনে নিতে হয়। আমি একথা কিছুতেই বুঝতে পারিনা, কেন

একজন অনার্যাকে রঘুবংশ ধ্বংস করার অবাধ অধিকার দেওয়া হবে? নিজের ছেলেকে যুবরাজ করবার জন্য এই যে ষড়যন্ত্র, তার বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে, কেন আমরা ধর্মের নামে, সত্যরক্ষার নামে মাথা নিচু করে থাকব? আপনি তো জানেন, মহারাজ কৈকেয়ীকে তার সঙ্কল্প ত্যাগ করবার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করেছেন। কই, সে তো মহারাজের অনুরোধ রাখে নি! বরঞ্চ রামচন্দ্র বনে না গেলে, সে অনাহারে দেহ ত্যাগ করবে বলে মহারাজকে ভয় দেখিয়েছে! ছলে, বলে, কৌশলে সে নিজের কাজ গুছিয়েছে; এ কি অধর্ম নয়? আর, আমরা এই অধর্মের কাছে পরাজয় স্বীকার করব?

কৌশল্যা—সুমিত্রা, তুমি অধৈর্য হয়ো না। অন্যায় যে করে, অন্যায়ের ফল সে একদিন পায়। যে হিংসা করে, তাকে হিংসা করে কোন লাভ হয় না। তাতে বরং বিরোধ বেড়ে ওঠে। সবাই দৈবের অধীন। আমাদের দৈবের ওপরই নির্ভর করতে হবে। কারণ, পথে যে জিনিস পড়ে থাকে, দৈবই তাকে রক্ষা করে। অথচ ঘরের মধ্যে সযত্নে রাখা জিনিসও দৈবের হাত থেকে রক্ষা পায় না। বিধাতার নিয়ম আমরা বুঝি না। বনে গিয়েও অসহায় ব্যক্তি তাঁর কৃপায় বাঁচে

আবার ঘরের মধ্যে থেকেও মানুষ রক্ষা পায় না। তুমি রাগ করো না। বিধির বিধান মেনে নাও। মনে শান্তি পাবে। আমি জানি, রামচন্দ্রের শোকে মহারাজ হয়ত বাঁচবেন না। এ ব্রহ্মশাপ। এ তুমি খণ্ডন করতে পারবে না। রামচন্দ্র বনে যাবে, আমার মনে হয় এ বিধির বিধান। কৈকেয়ী উপলক্ষ ছাড়া আর কিছু নয়।

[এমন সময় প্রবেশ করলেন লক্ষ্মণ। কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে প্রণাম করে তিনি বল্লেন।]

লক্ষ্মণ—মহাদেবি, আমি আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

সুমিত্রা—বিদায়? এ কি বলছ তুমি, লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণ—মা, আমি জানি রামচন্দ্রের সঙ্গে বনে যাব, এ আমার সঙ্কল্প।

সুমিত্রা—লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ—মা, আমি জানি আপনি কি বলবেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, মহাদেবীর কথা। তাঁর একমাত্র পুত্র যাচ্ছেন বনে। আমি শুনেছি, দাদাকে তিনি বনে যাবার অনুমতি দিয়েছেন। রামচন্দ্র আমার জীবনের আদর্শ। তাঁকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে ছায়ার মত আমি তাঁর সঙ্গে ঘুরব। প্রাণ দিয়ে আমি তাঁর করব

সেবা। এই সেবার অধিকারই আমি চাই, মা। আপনার এক ছেলে আপনার কাছে রইল। আর এক ছেলেকে দেখতে না পাওয়ার দুঃখ আপনি সহজেই সইতে পারবেন।

সুমিত্রা—লক্ষ্মণ, মায়ের কাছে সব ছেলেই সমান। কেউ তার অনাদরের নয়। রামচন্দ্রকেও আমি পুত্রাধিক স্নেহ করি। তুমি রামচন্দ্রের সঙ্গে বনে যাও, তার সেবা কর, তাকে সব রকমে রক্ষা কর, এই আমার অন্তরের কামনা।

লক্ষ্মণ—মা, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

কৌশল্যা—লক্ষ্মণ, তুমি আমার অন্তরের আশীর্বাদ গ্রহণ কর। যে সাধু, সে সব সইতে পারে, যে জ্ঞানী সে কোন কিছুর তোয়াক্কা করে না, যে ধীর, তার পক্ষে সব জিনিসই ত্যাগ করা সম্ভব। যে অদৃষ্টকে সুখদুঃখের কারণ বলে জানে, তার কোনই মোহ থাকে না।

আর সুমিত্রা বোন, রামচন্দ্রকে বনে যাবার অনুমতি দিয়ে আমি আমার কর্তব্য করেছি। কিন্তু তুমিই যথার্থ মায়ের কাজ করলে। এই ত্যাগে, এই উদারতায় তুমি হলে মহীয়সী, মাতৃজাতির আদর্শ। তোমার মহিমায় রঘুকুল আরও উজ্জ্বল হ'ল।

অনসূয়া ও সীতা

মহর্ষি অত্রির স্ত্রী অনসূয়া—সতী, সাধ্বী, ধর্মপরায়ণা।

একবার দেশে হ'ল অনাবৃষ্টি। মাঠ শুকিয়ে গেল, বীজ বোনা হ'ল না। হ'ল না শস্য। নদ, নদী, পুকুরের জল শুকিয়ে গেল। লোকের দুর্দশার আর সীমা রইল না। তারপর এল দুর্ভিক্ষ। আরম্ভ হ'ল মহামারী। সর্বত্র হাহাকার।

তাপসী অনসূয়া আশ্রমে করছেন তপস্যা। দেশের অবস্থায় কথা তিনি জানেন না। সংসারের কোলাহল তার কানে যায় না। সংসারের দুঃখকষ্ট তাঁর মনের কোন স্থান পায় না! ভগবানের উপাসনায় তাঁর যায় দিন।

একদিন আশ্রমের দ্বারে এল বহু লোক। তাদের কল-কোলাহলে তাপসীর ধ্যান ভেঙে গেল! মন হ'ল তাঁর অশান্ত। দৃষ্টি গেল আশ্রমের বাইরে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ওপর। তাদের চোখে জল, মুখ মলিন। পরণে ছেঁড়া কাপড়। তারা অনসূয়ার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

স্বর্গের দেবীর মত অনসূয়া এসে দাঁড়ালেন জনতার কাছে, মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি চাও ?

তারা উত্তর দিল, মা আমাদের বাঁচান। মাঠে শস্য নেই, নদীতে জল নেই। বনে ফল নেই। বৃষ্টি হয় নি অনেক দিন। আমরা না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছি। আমাদের বাঁচবার উপায় করুন।

তাপসী মুখে কিছু বললেন না। তিনি ধীরে ধীরে আবার ফিরে গেলেন তপস্যার আসনের কাছে। বসলেন তপস্যায়। সামনে জ্বলছে যজ্ঞের আগুন। তিনি বৃষ্টি কামনা করে যজ্ঞে আহুতি দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কালো মেঘে ছেয়ে গেল সারা আকাশ, আরম্ভ হ'ল মেঘের গর্জন, বিদ্যুৎ চমকাল, বইল শীতল বাতাস। মুষল ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। চাষীরা হ'ল উল্লসিত। তারা লাঙ্গল নিয়ে মাঠে বার হ'ল। দেশের লোক আনন্দে আত্মহারা। দিকে দিকে উঠল তাপসী অনসূয়ার জয়ধ্বনি।

এই ব্রহ্মবাদিনী পতিব্রতা অনসূয়ার নাম জানতেন রামচন্দ্র। চোদ্দ বছর বনবাসের প্রথম দিকে তিনি তখন বাস করছেন চিত্রকূট পর্বতের এক নিরালায়। ভরত তাঁকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য চিত্রকূটে এসেছিলেন। অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি। রামচন্দ্রের অনুরোধে ভরত নন্দীগ্রামে চলে গিয়েছেন।

রামচন্দ্র বুঝতে পারলেন এখানে থাকা আর ঠিক হবে না। অযোধ্যাবাসীরা আবার এখানে আসতে পারে। তাই তিনি চিত্রকূট থেকে দূরে আর এক গভীর বনে আশ্রয় নেবার মনস্থ করলেন। সীতা ও লক্ষ্মণ সহ তিনি একদিন যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য, অত্রিমুনির আশ্রম দেখে, অনসূয়াকে প্রণাম করে নতুন বনে নতুন আশ্রম তৈরি করে বাস করবেন। একদিন রাম-সীতা-লক্ষ্মণ এসে উপস্থিত হলেন অত্রি মুনির

আশ্রমে। মহর্ষি অত্রি আশ্রমেই ছিলেন। তিনি অতিথিদের সমাদর গ্রহণ করে আশীর্বাদ করলেন।

অতিথিদের সাড়া পেয়ে আশ্রমের বাইরে এলেন ব্রহ্মবাদিনী অনসূয়া। রাম-সীতা-লক্ষ্মণ বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন তাপসীর দিকে। অনেক বয়স হয়েছে তাঁর। মাথার চুল সব সাদা। গায়ের চামড়া পড়েছে ঝুল। বাতাসে কলাগাছ যেমন কাঁপে, তিনিও তেমনি অনবরত কাঁপছেন, কিন্তু দেহে দিব্য জ্যোতি। রাম-লক্ষ্মণ তাঁকে প্রণাম করে অত্রি মুনির সঙ্গে আশ্রমের অপর দিকে চলে গেলেন। অনসূয়া সীতাকে আশীর্বাদ করে বললেন, সীতা, তুমি সুখী হও। তুমি আত্মীয়, বন্ধু, সুখ, অভিমান, সব ত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে এসেছ বনে। তুমি পুণ্যবতী। তোমার হবে অক্ষয় স্বর্গবাস।

সীতা বিনীতকণ্ঠে উত্তর দিলেন, দেবি আমি জানি স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি। আমার স্বামী যদি গুণহীনও হতেন, তাহলেও আমি তাঁর সেবা করতাম। কিন্তু তিনি সব গুণের আধার। তাঁর সেবা আমি শ্রেষ্ঠ তপস্যা বলে মনে করি। আমাদের বিয়ের সময় অগ্নির কাছে আমার মা আমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা আমি ভুলি নি। পতি-সেবার চেয়ে স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ তপস্যা আর কিছুই নেই। পতির সেবা করে সাবিত্রী তিন-ভুবনে পূজনীয়। আপনার পতিসেবাও সাবিত্রীর সহিত তুলনীয়। আমার নিজের কোন গুণ নেই। আপনাদের পথই আমি অনুসরণ করছি।

অনসূয়া খুশি হয়ে বললেন, মা সীতা, তুমি আমার কাছে বস। আমি শুনেছি, রামচন্দ্র তোমাকে স্বয়ম্বরে লাভ করেছিলেন। সেই স্বয়ম্বরের বৃত্তান্ত আমাকে বল। আমার সে বৃত্তান্ত শোনবার বড় ইচ্ছা।

সীতা বলতে লাগলেন, মিথিলার রাজা রাজর্ষি জনক আমার বাবা। তিনি একবার যজ্ঞের ভূমি তৈরি করবার জন্য লাঙ্গল দিয়ে জমি চষতে আরম্ভ করেন। এমন সময় তিনি দেখেন এক অদ্ভুত ব্যাপার। লাঙ্গলের মুখে মাটি থেকে উঠল এক সদ্যোজাত শিশু। তার সারা গায়ে ধূলামাখা। সেই শিশুই আমি। রাজর্ষি আমাকে কোলে তুলে নেন। সঙ্গে সঙ্গে হয় দেববাণী—রাজর্ষি জনক তোমার কোন সন্তান নেই। এই শিশু তোমার মানসী কন্যা।

রাজর্ষি আমাকে নিয়ে এলেন অন্তঃপুরে। বড় রাণী আমাকে পালন করতে লাগলেন। দিন যেতে লাগল। ক্রমে হ'ল আমার বিয়ের বয়স। বাবা আমার বিয়ের জন্য চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু বহু চিন্তা করেও আমার যোগ্য বর খুঁজে পেলেন না। অবশেষে তিনি এক স্বয়ম্বর সভা ডাকলেন।

পুরাকালে দেবাদিদেব মহাদেব আমার বাবার পূর্বপুরুষ দেবরাজের কাছে একটি ধনু ও দুটি অক্ষয় তূণীর রেখেছিলেন। এই হরধনু ছিল অত্যন্ত ভারী। হাজার হাজার বীর একসঙ্গে চেষ্টা করে অতিকষ্টে এই হরধনু তুলতে পারত, কোন মতে বয়ে নিয়ে যেতে পারত মাত্র। এই হরধনুতে ছিলা

লাগানো কারো একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অনেক বীর, মহাবীর, রাজা মহারাজ চেষ্টা করেছেন, কেউ পারেন নি। তাই বাবা ঘোষণা করলেন, যে বীর একা এক হাতে এই হরধনু তুলে এতে ছিলা লাগাতে পারবে, তারই সঙ্গে আমার মেয়ে সীতার বিয়ে হবে।

স্বয়ম্বর সভার দিন স্থির হ'ল। সভায় এলেন দেশ-বিদেশে থেকে রাজ-রাজড়ারা, বীর-মহাবীরেরা। তাঁরা দেখলেন হরধনু। এই ধনু তোলবার জন্য অনেকে অনেক চেষ্টা করলেন, পারলেন না। আবার অনেকে ধনু দেখেই সরে পড়লেন। স্বয়ম্বর সভা ভেঙ্গে গেল। বাবা আবার চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

অনেক দিন পরের কথা। বাবা আবার এক যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র মুনি এলেন অযোধ্যার রাজা দশরথের দু' ছেলে রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে।

বিশ্বমিত্র বললেন, রাজর্ষি জনক, রামলক্ষ্মণ আপনার হরধনু দেখতে এসেছেন।

বাবা তৎক্ষণাৎ যজ্ঞস্থলে আনালেন হরধনু। রামচন্দ্র অনায়াসেই বাঁ হাতে তুলে নিলেন হরধনু। ব্যাপার দেখে বিস্মিত হলেন বাবা আর মন্ত্রিগণ। কিন্তু তাঁদের বিস্ময়ের শেষ হতে না হতেই রামচন্দ্র তাতে ছিলা পরবার জন্য দু' প্রান্ত টেনে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে হরধনু দু'খণ্ডে ভেঙ্গে গেল! হঠাৎ যেন বজ্রপাত হ'ল! ভীষণ শব্দ শুনে মিথিলার নরনারী সব ভীত হ'ল। অনেকে হ'ল মূর্ছিত।

বাবা ও মন্ত্রিগণ রামচন্দ্রের শক্তির প্রশংসা করতে লাগলেন। তারপর যজ্ঞস্থলেই বাবা রামচন্দ্রের হাতে আমাকে দান করবার জন্য উদ্যোগী হলেন।

রামচন্দ্র তাঁকে করজোড়ে নিবেদন করলেন, মহারাজ অযোধ্যাপতির ইচ্ছা কি তা আমরা কেউ জানিনা। তিনি যদি অনুমতি দেন, তা হলে আমি আপনার কন্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পারি।

সঙ্গে সঙ্গে দূত চলে গেল অযোধ্যায়। এলেন মহারাজ দশরথ। তিনি বিবাহে অনুমতি দিলেন। আমার সঙ্গে বিয়ে হ'ল রামচন্দ্রের আর আর আমার ছোটবোন উর্মিলাকে বিয়ে করলেন লক্ষ্মণ। আর, আমার খুড়ো কুশধ্বজের দুই কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির সঙ্গে বিয়ে হ'ল ভরত আর শত্রুঘ্নের।

দেবি, সকল গুণের-আধার আমার স্বামীর প্রতি আমি চিরদিন অনুরাগী থাকব।

সীতার মুখের স্বয়ম্বর-কাহিনী শুনে খুশি হলেন অনসূয়া।

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা হ'ল। অনসূয়া বলিলেন, মা সীতা! আজ আর যেও না, এখানে বিশ্রাম কর। দণ্ডকারণ্যের দিকে আগামী কাল যাত্রা করবে।

সে রাত্রি আশ্রমে যাপন করে পরদিন রাম-সীতা-লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যের বনে প্রবেশ করলেন।

জটায়ু ও রাবণ

দণ্ডকারণ্য।

এই দণ্ডকারণ্যে বাস করছেন রাম, সীতা আর লক্ষ্মণ। তাঁদের আশ্রমের চারদিকে কলাগাছ। এই কলাগাছের মধ্যে আশ্রম-কুটীরটি বড় সুন্দর।

একদিন রাম, সীতা, লক্ষ্মণ বসে আছেন কুটীরের দুয়ারে। দূরে দেখা গেল এক অপরূপ সোনার হরিণ।

সোনার দেহে শত শত রূপার বিন্দু, মাঝে মাঝে ইন্দ্রনীল, চন্দ্রকান্ত, সূর্যকান্ত মণির পদ্ম। মাথার চারটি সুন্দর সোনার শিং। তার ওপর নানা উজ্জ্বল মণি।

সীতা দেখতে পেলেন সোনার হরিণ, রামচন্দ্রকে ডেকে বললেন, দেখুন, দেখুন, কেমন হরিণ! সত্য কথা বলতে কি, হরিণটি যদি আমি পাই, তাহলে এর চামড়া পেতে শুতে পারি।

রামচন্দ্রও হরিণটিকে দেখতে পেলেন। সীতার কথায় তিনি হরিণটিকে মারবার জন্য তীর-ধনুক নিয়ে ওঠে দাঁড়ালেন।

লক্ষ্মণও দেখতে পেয়েছেন সোনার হরিণ। শুনতে পেয়েছেন সীতার বাসনা।

রামচন্দ্র হরিণ মারবার জন্য প্রস্তুত হলেন। লক্ষ্মণ মনে মনে ভাবলেন, এ কি সোনার হরিণ? না কোন মায়া-হরিণ? শিকারী রাজাদের কাছে তিনি এই মায়া-হরিণের কথা অনেক

শুনেছেন। অনেকে এই মায়া-হরিণ শিকার করতে গিয়ে নিজেরাই প্রাণ হারিয়েছেন। পৃথিবীতে সোনার হরিণ কি সম্ভব ?

লক্ষ্মণ নিজের মনের কথা বললেন রামচন্দ্রকে। রামচন্দ্র উত্তর দিলেন, এ হরিণ আমি বধ করবই। যদি মায়া-হরিণ হয়, তাহলেও এর নিস্তার নেই। তুমি কুটীরে থাক। আমি হরিণ-বধ করে এখনি ফিরে আসছি। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত সীতাকে একা রেখে বাইরে যেও না।

কুটীর থেকে বার হলেন রামচন্দ্র। হরিণ চলে গেল একটু দূরে। রামচন্দ্রও এগিয়ে গেলেন। এভাবে হরিণের পেছনে পেছনে রামচন্দ্র এলেন গভীর বনে। এসে দাঁড়ালেন এক সমতল স্থানে। হরিণও খানিক দূরে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

পরিশ্রান্ত রামচন্দ্রের হ'ল রাগ। তিনি অকস্মাৎ হরিণকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লেন। হরিণ আর পালাতে পারল না। যন্ত্রণায় ছদ্মবেশ ছেড়ে রাক্ষস-মূর্তিতে চেঁচিয়ে উঠল, হা সীতা ! হা লক্ষ্মণ !

রাম চমকে উঠলেন, এ তবে হরিণ নয়, লক্ষ্মণ যা বলেছে, তাই তো ঠিক !

নতুন বিপদের আশঙ্কায় অধীর হলেন রামচন্দ্র। মায়াবী রাক্ষসের চিৎকার শুনে যদি লক্ষ্মণ ছুটে চলে আসে ! তাই তাড়াতাড়ি তিনি কুটীরের দিকে এগোতে লাগলেন।

এদিকে রাক্ষসের চিৎকার শুনতে পেয়েছেন সীতা, শুনতে পেয়েছেন লক্ষ্মণ।

সীতা লক্ষ্মণকে বললেন, লক্ষ্মণ, তুমি এখনি ছুটে যাও। হয়ত আর্যপুত্র কোন বিপদে পড়েছেন।

দণ্ডকারণ্যে রাক্ষসের বড় ভয়। সীতাকে একা রেখে বাইরে যেতে লক্ষ্মণের ইচ্ছা নেই। তা ছাড়া, দাদার আদেশ আছে, সীতাকে একা রেখে কোথাও যেও না।

সীতা লক্ষ্মণের মনের ভাব বুঝতে পারলেন না। তিনি তাঁকে কঠিন তিরস্কার করতে লাগলেন।

সীতার দুর্বাক্য লক্ষ্মণ সহ্য করতে পারলেন না। ছুটে কুটীর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সীতা একা রইলেন।

এধারে লঙ্কার রাজা রাবণ তার অনুচর মারীচকে সোনার হরিণরূপে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে বনের মধ্যে অপেক্ষা করছিল। অদূরেই ছিল তার রথ।

আশ্রম-কুটীরে সীতা ছাড়া আর কেউ নেই। এই সুযোগ রাবণ ভিক্ষুকের বেশে দাঁড়াল এসে কুটীরের দুয়ারে। তারপর নিজ মূর্তি ধরে নিজের পরিচয় দিয়ে জোর করে সীতাকে হরণ করে নিয়ে রথে গিয়ে উঠল

চিৎকার করে উঠলেন সীতা। তাঁর কান্না ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত অরণ্যে। সীতা কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, জনস্থানের নদী, পুকুর, পাহাড়, পর্বত, পশু, পাখী, গাছ, তোমরা শোন। লঙ্কার রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। তোমরা আমার স্বামীকে এই সংবাদ দাও। আমি নিরুপায়। এখন আমাকে রক্ষা করবার কেউ নেই।

জনস্থানের পাহাড়ে ঘুমিয়ে ছিল মহারাজ দশরথের বন্ধু পক্ষিরাজ জটায়ু। সীতার কান্নার শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। শুনতে পেল তাঁর করুণ কাহিনী। যৌবনে জটায়ুর দেহে ছিল অসীম বল। আজ সে বৃদ্ধ, বলহীন। তবুও দুঃখিনী নারীর কান্না সহ্য করতে পারল না। কে রক্ষা করবে এ অসহায়া নারী সীতাকে ? জনস্থান তো জনশূন্য। রাক্ষসের আবাস। তারা সবাই লঙ্কার রাজা রাবণের অনুচর। সুতরাং রাবণের এই অন্যায় কাজে বাধা দেবার শক্তি কারো নেই। থাকলেও রাবণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এমন সাহসী কেউ নেই।

রাবণ লঙ্কার রাজা। তার নামে ত্রিভুবনের সবাই কাঁপে। দেবতারা পর্যন্ত তার আজ্ঞাবহ দাস—ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি দেবগণ তার সেবা করেন।

তা হোক। সে অশক্ত হলেও, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ গেলেও, তার এই অন্যায় কাজে সে বাধা দেবেই।

জটায়ুর আর ভাববার সময় নেই। শোনা যাচ্ছে রথের শব্দ। শোনা যাচ্ছে শোকার্ত নারীর করুণ রব।

জটায়ু উড়ল আকাশে। বিশাল তার দেহ। পর্বতের মত রথের পথ আঁটকে দাঁড়াল। রাবণের রথ থেমে গেল।

জটায়ু রাবণকে বললে, রাবণ, তুমি সীতাকে ছেড়ে দাও। নইলে তোমার মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না। আমার হাতে বেঁচে গেলেও রামচন্দ্র তোমাকে ক্ষমা করবেন না। মূর্খ, যে ভার বইতে পারা যায়, তাই নেওয়া উচিত। যে

খাবার শরীরকে পোষণ করে, সে-খাবার খাওয়াই উচিত যে রত্নে জীবন নাশ হয়, তা কখনো ধারণ করা উচিত নয়। যে কাজ করলে অর্থ ও যশ নষ্ট হয়, তা ত্যাগ করাই উচিত।

রাবণ উত্তর দিল, জটায়ু, তোমার উপদেশ শুনতে লঙ্কার রাজা রাবণ প্রস্তুত নয়। আমার অপেক্ষা করবার আর সময় নেই। তুমি সরে যাও। আর যদি না যাও, মনে রেখো, তোমার জীবন বিপন্ন হবে।

জটায়ু বললে, একজন অসহায়া নারীকে রক্ষা করতে গিয়ে যদি আমার মৃত্যুও হয়, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আমি জানি, তুমি আছ রথে, হাতে আছে অস্ত্রশস্ত্র, আর দেহ তোমার বর্মে ঢাকা। আমি নিরস্ত্র। কিন্তু তবুও তোমাকে আমি নির্বিঘ্নে যেতে দেবো না। আমাকে জীবিত রেখে তুমি জানকীকে নিয়ে লঙ্কায় ফিরে যেতে পারবে না। আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছি।

রাবণের কুড়িটি চোখ রাগে আগুনের মত লাল হয়ে উঠল। কুড়ি-হাতে অস্ত্র ঝন্ ঝন্ শব্দে বেজে উঠল। ভীম-বেগে রাবণ জটায়ুকে আক্রমণ করল। পক্ষিরাজ জটায়ু নিরস্ত্র। তবুও সে ভয় পেল না। পাখা, ঠোঁট ও পায়ের নখ নিয়ে রাবণকে বারংবার আঘাত করতে লাগল।

জটায়ু ও রাবণের যুদ্ধ ভীষণ হয়ে উঠল।

জটায়ু রাবণের তীর অগ্রাহ্য করে তার পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ধারালো নখ দিয়ে রাবণের সমস্ত দেহ ক্ষত-

১। সীতার দুর্বাক্য সহ্য করতে না পেরে, লক্ষ্মণ বেরুলেন।

২। এই সুযোগে রাবণ ভিক্ষুকের বেশে, সীতাকে রথে নিয়ে গেল।

৩। সীতার করুণ রব শুনে জটায়ু রাবণের রথ আঁটকে দাঁড়াল।

৪। জটায়ু বললে, রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেল।

বিক্ষত করে ফেলল। রক্তে রথ ভেসে গেল। রাবণের সারথি নিহত হ'ল। রথের চূড়া ভেঙে গেল। রাজমুকুট রাজার মাথা থেকে খসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রথও মাটিতে পড়ে গেল।

রাবণের অস্ত্রের আঘাতে জটায়ুও হ'ল অবসন্ন। রক্তে তার শরীর ভিজে গেল। সে আর দাঁড়াতে পারল না, অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রাবণ অসি দিয়ে তার দুটি পাখা কেটে দিল, তারপর সীতাকে নিয়ে লঙ্কার দিকে চলে গেল।

এদিকে রামচন্দ্র মারীচকে বধ করে ফিরে আসছিলেন। পথে লক্ষ্মণকে দেখে রামচন্দ্র চমকে উঠলেন। কি একটা অজানা আশঙ্কায় তাঁর বুক কেঁপে উঠল।

দু'জনে তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরে এলেন।

রামচন্দ্র ডাকলেন, সীতা! সীতা!

কুটীর থেকে কোন সাড়া এল না, কেউ হাসিমুখে দ্বারে এসে দাঁড়াল না। রাম-লক্ষ্মণ হলেন আতঙ্কিত। তারা তাড়াতাড়ি কুটীরে এসে দেখলেন, কুটীর শূন্য! কোথাও সীতা নেই!

আশ্রমের চারদিকে খোঁজ করা হ'ইল। সীতাকে পাওয়া গেল না। এবার জনস্থানের সর্বত্র খোঁজা আরম্ভ হ'ল। খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা দেখতে পেলেন মৃতপ্রায় জটায়ুকে।

রামচন্দ্রের মনে হ'ল এ পাখীও কোনো মায়াবী রাক্ষস। হয়ত এই রাক্ষসই সীতাকে খেয়ে ফেলেছে!

রামচন্দ্র ধনুকে তীর বসিয়ে এগিয়ে এলেন জটায়ুর কাছে।

জটায়ুর মুখ দিয়ে তখন রক্ত বার হচ্ছে, নিশ্বাস হয়েছে ঘন। মৃত্যুর আর দেরী নেই। অতি কষ্টে শ্বাস নিয়ে জটায়ু বললে, রামচন্দ্র, যাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছ, তাঁকে লঙ্কার রাজা রাবণ এইমাত্র হরণ করে নিয়ে গেল। আমি যথাসাধ্য বাধা দিয়েছি। সীতাকে রক্ষা করতে পারিনি। যুদ্ধে আমি পরাজিত। ঐ দেখ, রাবণের ভাঙা তীর-ধনু, অস্ত্রশস্ত্র। আমার নাম জটায়ু। আমি তোমার বাবার বন্ধু।

এবার রামলক্ষ্মণ জটায়ুকে চিনতে পারলেন। তাঁরা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রামচন্দ্র বললেন, লক্ষ্মণ, আমার ভাগ্যই মন্দ। আমি রাজ্য হারিয়েছি, এখন হারালাম সীতাকে। তারপর আবার হারাতে বসেছি আমার পিতৃসম পক্ষিরাজ জটায়ুকে।

জটায়ু রামচন্দ্রকে বললে, রামচন্দ্র, দুঃখ করো না। তুমি পুরুষের শ্রেষ্ঠ। পুরুষের মত কাজ কর। আমি জানি রাবণ আর বেশী দিন বেঁচে থাকতে পারবে না। রাবণকে যুদ্ধে নিহত কর। উদ্ধার কর সীতাকে।

এই বলে জটায়ু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

সীতাকে রক্ষা করতে গিয়ে মহাবীর পক্ষিরাজ দিল প্রাণ। তার যশ ছড়িয়ে পড়ল ত্রিভুবনে। জটায়ু হ'ল অমর।

* * * *

ব্যাকুল রামচন্দ্র শেষ পর্যন্ত সীতার খোঁজ পেলেন জটায়ুর কাছে। শুনতে পেলেন, লঙ্কার রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে।

কিন্তু কোথায় লঙ্কা ? কে তার খোঁজ দেবে ? রাম-লক্ষ্মণ তন্নতন্ন করে এ-বন সে-বন খুঁজতে লাগলেন। চলতে লাগলেন দক্ষিণ দিকে। এলেন ক্রৌঞ্চবনে।

এই ক্রৌঞ্চবনে ছিল এক কবন্ধ রাক্ষস। তার মাথা নেই, নেই কাঁধ। পেটে তার মুখ। আর তাতে একটা মাত্র চোখ। চোখটি জ্বলছে যেন আগুনের শিখা। হাঁটু ভাঙা, হাত দুটি যোজন-প্রমাণ লম্বা। সে লক্ষ্মণকে আক্রমণ করল। সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্র খড়্গ দিয়ে তার দীর্ঘ হাত দুটি কেটে ফেললেন।

রামচন্দ্রের পরিচয় পেয়ে কবন্ধ শান্তমুখে বললে, হে রামচন্দ্র, আজ আমার শাপমুক্তি হ'ল।

রামচন্দ্র বললেন, তুমি তো রাক্ষস। লঙ্কার রাবণকে নিশ্চয়ই জান। সে আমার স্ত্রী সীতাকে হরণ করেছে। যদি জান, তবে বল, কেমন করে তাকে উদ্ধার করব।

কবন্ধ উত্তর দিল, প্রভু, আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। বেশি কিছু বলবার ক্ষমতা নেই। আপনি ঋষ্যমূক পর্বতে গিয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন। তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন। এই বলে কবন্ধ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল।

কবন্ধের সংকার করে রাম-লক্ষ্মণ ঋষ্যমূক পর্বতের দিকে চলতে লাগলেন।

———

বালী ও সুগ্রীব

ঋষ্যমূক পর্বতের যোজন খানেক দূরেই কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য। কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালী। সুগ্রীব তার ছোট ভাই। দাদা ভাইকে খুব ভালবাসে। দাদার প্রতিও ভাইয়ের খুব শ্রদ্ধা আর ভক্তি। বেশ সুখেশান্তিতে দিন কাটছে।

বালী মস্ত বড় বীর। শরীরেও অসীম শক্তি। সে প্রতিদিন পৃথিবীর চার-সমুদ্রের তীরে বসে জপ-আহ্নিক করত, করত সন্ধ্যা-বন্দনাদি। তারপর জপ-আহ্নিকাদি শেষ করে সমুদ্রের কাছে যে সব পাহাড় ছিল, তাদের চূড়া ভেঙে চারদিকে ছুঁড়ে ফেলত।

এই রকম এক পাহাড়ে বাস করত দুন্দুভি নামে এক মহাকায় ভীষণ অসুর। তার চেহারা ছিল মোষের মত। মাথায় ছিল শিং। সেও নিজের শক্তি প্রকাশ করবার জন্য দাপাদাপি করে বেড়াত। বালীর মতনই ছিল সে অহঙ্কারী। বালীর উপদ্রবে সে বিরক্ত হ'ল। একদিন সে গিয়ে হাজির হ'ল কিষ্কিন্ধ্যায়। বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করল।

সংবাদ গেল বালীর কাছে। বালী এসে বলল, দুন্দুভি, ফিরে যাও। অনর্থক কেন প্রাণ হারাবে।

দুন্দুভি উত্তর দিল, ফিরে যাবার জন্য আসিনি। বানরের কত শক্তি, তা দেখবার আমার একান্ত ইচ্ছা।

গর্জন করে উঠল বালী, আমি এখনো বলছি, তুমি পালাও।

একটা মোষের সঙ্গে যুদ্ধ করা কিষ্কিন্ধ্যার রাজার শোভা পায় না।

দুন্দুভি বললে, তুমি যদি ভয়ই পেয়ে থাক, বালী, তা হলে আমার বলবার কিছু নেই। যুদ্ধ না কর, একটা প্রতিজ্ঞা কর।

বালী প্রশ্ন করল, কি প্রতিজ্ঞা ?

দুন্দুভি উত্তর দিল, আমি যে পাহাড়ে থাকি, তুমি তার কাছে যাবে না !

বালী বললে, তা হয় না।

দুন্দুভি এবার গর্জন করে উঠল, তবে যুদ্ধ কর।

বেশ তাই হোক,—এই বলে বালী এগিয়ে এসে দুন্দুভির বড় বড় দুটো শিং ধরে মুহূর্তের মধ্যে ওপরে তুলে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। চীৎকার করে উঠল দুন্দুভি। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। তার বিরাট দেহ গিয়ে পড়ল ঋষ্যমূক পর্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রমের দুয়ারে। শব্দ শুনে মুনি দুয়ার খুলে বার হয়ে এলেন। দেখলেন, একটা পাহাড়প্রমাণ মোষ মরে পড়ে আছে। আশ্রমের মাটি ভেসে যাচ্ছে রক্তে। মতঙ্গ মুনি বুঝলেন, এ কাজ বালীর। তিনি শাপ দিলেন, যে বানর এ কাজ করেছে, সে যদি আমার আশ্রমের এক যোজনের মধ্যে আসে, তা হলে তখনি তার মৃত্যু হবে।

শাপের কথা শুনে বালী মতঙ্গ মুনির পায়ে ধরে তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি শাপ ফিরিয়ে নিলেন না! আশ্রমের এক যোজনের মধ্যে বালীর যাওয়া বন্ধ হ'ল।

দুন্দুভির ভায়ের নাম মায়াবী। মায়াবী বড় হ'ল। সে দাদার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

এক রাতের কথা। বালী অন্তঃপুরে ঘুমিয়ে আছে, এমন সময় রাজবাড়ীর বাইরে উঠল এক ভীষণ গর্জন। এ গর্জনে সবার ঘুম ভেঙে গেল। রাজবাড়ীর সবাই জেগে উঠল। বালীর কাছে একজন দূত এসে বললে, মহারাজ, দুন্দুভির ভাই মায়াবী আপনাকে যুদ্ধে আহ্বান করছে।

বালী বীর, ভয় কাকে বলে জানে না। যুদ্ধেই তার আনন্দ। সে অন্তঃপুরের বাইরে এল। পথ আটকে দাঁড়াল ভাই সুগ্রীব। সে বললে, দাদা, একা এই রাত্রে তোমার যুদ্ধে যাওয়া ঠিক নয়। কাল ভোর হলে যা হয় করবে।

বালা উত্তর দিল, সুগ্রীব, মায়াবী আমার শত্রু। তার দাদাকে আমি বধ করেছি। বেঁচে থাকলে সে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে। সুতরাং শত্রুর শেষ রাখতে নেই। আমি যুদ্ধে যাব। যুদ্ধ সব সময়ই করা যায়।

এই বলে বালী রাজবাড়ী থেকে বার হয়ে গেল।

দাদার বিপদের আশঙ্কায় সুগ্রীবও বালীর পেছনে পেছনে চলতে লাগল।

এধারে মায়াবী দু'জনকে আসতে দেখে ভয় পেয়ে গেল। দু'জনের সঙ্গে একা যুদ্ধে পেরে উঠবে না। তাই সে আত্মরক্ষার জন্য ছুটতে ছুটতে একটা গর্তে ঢুকে গেল। তাকে আর দেখা গেল না।

দু'ভাই এসে দাঁড়াল গর্তের মুখে। বালী বললে, সুগ্রীব, তুমি গর্তের মুখে অপেক্ষা কর। আমি ভেতরে যাই। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখান থেকে নড়বে না।

সুগ্রীব উত্তর দিল, আমি তোমার কথামতই কাজ করব। কিন্তু আমার অনুরোধ, তুমি একা যেও না। আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

বালী বললে, যদি যুদ্ধই হয়, তবে আমি একাই যুদ্ধ জয় করতে পারব। তোমার যাবার দরকার নেই। তুমি এখানেই থাক।

সুগ্রীব উত্তর দিল, বেশ তাই হবে।

বালী গর্তের মধ্যে প্রবেশ করল। তারপর অনেক দিন বালীর আর কোন সংবাদ নেই। প্রায় এক বছর কেটে গেল।

সুগ্রীব উদ্বিগ্ন হ'ল। বালীর জীবনের আশঙ্কায় সে শঙ্কিত হয়ে উঠল। এমন সময় হঠাৎ একদিন গর্তটা কেঁপে উঠল। গর্তের মধ্যে শোনা গেল ঘোর গর্জন!

কার এই গর্জন বুঝতে পারল না সুগ্রীব। তারপর আর এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল। গর্তের মুখ দিয়ে বার হতে লাগল রক্ত, যেন মাটির ভেতর থেকে উঠছে রক্তের ফোয়ারা!

সুগ্রীবের চোখের জলে বুক ভেসে গেল। সে বুঝল মায়াবী বালীকে যুদ্ধে বধ করেছে। আর অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই। একটা বড় পাথর দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিয়ে সে কাঁদতে কাঁদতে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এল।

বালীর মৃত্যুসংবাদে কিষ্কিন্ধ্যায় উঠল হাহাকার। কিন্তু রাজার সিংহাসন শূন্য থাকতে পারে না। সুগ্রীব হ'ল কিষ্কিন্ধ্যার রাজা। মন্ত্রীদের সাহায্যে সে রাজ্য চালাতে লাগল। এ ভাবে আরও কিছুকাল কেটে গেল।

হঠাৎ একদিন কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এল বালী। সিংহাসনে সুগ্রীবকে দেখে রাগে আগুন হয়ে বালী বললে, আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি, আমার আদেশ অগ্রাহ্য করে কেন চলে এসেছ। সিংহাসনের লোভেই তার কারণ। ধিক্ সুগ্রীব, ধিক্।

সুগ্রীব তাড়াতাড়ি সিংহাসন থেকে নেমে এসে দাদাকে প্রণাম করে, পায়ের কাছে রাখল মুকুট। তারপরে বললে, দাদা, আমি তোমার জন্য এক বছর অপেক্ষা করেছিলাম। তারপর গর্তের মুখে রক্ত দেখে মনে হ'ল, তুমি বেঁচে নেই। তাই আমি ফিরে এলাম কিষ্কিন্ধ্যায়। রাজ্যে আমার লোভ ছিল না, এখনো নেই। রাজা ছাড়া রাজ্য চলতে পারে না। তাই মন্ত্রীদের অনুরোধে আমি সিংহাসনে বসেছিলাম। এবার তোমার রাজ্য তুমি ফিরিয়ে নাও। আমাকে মুক্তি দাও।

মন্ত্রীরাও সুগ্রীবের কথায় সায় দিল।

শান্ত হ'ল না বালী, বললে, সুগ্রীব, তুমি কপট আর কুটিল। তুমি মন্ত্রীদের ভুল বুঝিয়েছ। মায়াবীকে অনেক চেষ্টার পর আমিই বধ করেছি। শুধু তাকেই নয়। তার সমস্ত অনুচরদেরও আমি হত্যা করেছি। তাদের রক্তেই গর্ত ভরে গিয়েছিল। আমি যখন যুদ্ধ শেষ করে গর্তের মুখে ফিরে

এলাম, তখন দেখলাম গর্তের মুখ বন্ধ। তোমাকে ডেকেও সাড়া পেলাম না। আমি তোমার উদ্দেশ্য অনুমান করলাম। অতি কষ্টে পাথর ভেঙে বার হয়ে এলাম। এখন দেখছি আমার অনুমান সত্য।

সুগ্রীব উত্তর দিল, দাদা, আমার আর কিছু বলবার নেই। তবুও আবার বলি, আমাকে ভুল বুঝো না। আমার কোন মন্দ উদ্দেশ্য ছিল না। আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। ভায়ে-ভায়ে বিবাদে মঙ্গল নেই। তুমি যে শাস্তি দেবে, আমি তা মাথা পেতে নেব। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, তোমার তুষ্টির জন্য আমি কিষ্কিন্ধ্যা ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত।

সুগ্রীবের কথায় শান্ত হ'ল না বালী। রাগ মানুষের পরম শত্রু। রাগের বশে ভালমন্দ-জ্ঞান লোপ পায়।

বালীর বিশ্বাস হ'ল না সুগ্রীবের কথা। রাগে সে ফেটে পড়ল, বললে, তুমি এখনি আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যাও। তোমার মুখ আর আমি দেখতে চাই না।

সুগ্রীব মন্ত্রীদের দিকে চেয়ে বললে, দাদার আদেশ মেনে নিলাম। রাজ্যে থাকার অধিকার আমার আছে। সে দাবি আমি ছেড়ে দিলাম। আপনারা বলুন, আমি কোথায় যাব।

প্রধান মন্ত্রী বললে, রাজাব আদেশ যখন আপনি মেনে নিয়েছেন, তখন ঋষ্যমূক পর্বতে গিয়ে বাস করুন। সেখানে আপনি নিরাপদে থাকতে পারবেন। সে স্থান আপনার দাদার রাজ্যের অংশ নয়।

তাই হ'ল। সুগ্রীব নিজের বন্ধুবান্ধব ও অনুচরদের নিয়ে চলে গেল ঋষ্যমূক পর্বতে। রাজার নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা মনে করে তার দিন কাটতে লাগল।

এইভাবে দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। সুগ্রীবের মনে সুখ নেই, শান্তি নেই। মনে পড়ে কিষ্কিন্ধ্যার কথা, মনে পড়ে দাদার কথা। মনটা বিষাদে ভরে যায়।

একদিন ঋষ্যমূক পর্বতের গুহায় বসে আছে সুগ্রীব। আর সঙ্গে আছে অনুচররা আর বন্ধুগণ। হঠাৎ করুণ কান্নার শব্দে সবাই চমকে উঠল। দেখতে পেল, একজন নীল রঙের পুরুষ সোনার প্রতিমার মত এক রমণীকে জোর করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আর সে রমণী আকুল হয়ে চিৎকার করছে, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! দুষ্ট রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেল! আর, সে কাঁদতে কাঁদতে ফেলে দিচ্ছে মাথার ওড়না আর গায়ের গয়না। রমণীর ফেলে দেওয়া জিনিস সুগ্রীব যত্ন করে রেখে দিল।

কয়েক দিন পরের কথা। সেদিনও ঋষ্যমূক পর্বতের গুহায় সুগ্রীব বসে আছে। এমন সময় সেখানে এলেন অস্ত্রধারী দু'জন পুরুষ। একজনের গায়ের রং নতুন দুর্বার মত সবুজ আর দ্বিতীয় জনের রং কাঁচা সোনার মত ফরসা।

ভয় পেল সুগ্রীব। এরা বালীর অনুচর নয়ত? বালীর ঋষ্যমূক পর্বতে আসার কোন উপায় নেই। এমনো হতে পারে, সে গোপনে চর পাঠিয়েছে তাকে হত্যা করবার জন্য। ভয় পেয়ে সে মনের কথা জানাল তার বন্ধুদের, অনুচরদের।

একজন বললে, শুধু শুধু ভয় পেয়ে কোন লাভ নেই। এঁরা বালীর অনুচর হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। এঁদের সঙ্গে কথা বললেই সব বুঝতে পারা যাবে।

প্রিয় অনুচর হনুমান কাছেই ছিল। সুগ্রীব আদেশ দিল, তুমি নিজের পরিচয় গোপন করে গিয়ে এঁদের সঙ্গে কথা বল।

হনুমান ধরল ভিখারীর বেশ। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এল পুরুষ দু'জনার কাছে, খুব বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কে? আর, কেনই বা এখানে এসেছেন?

ফরসা লোকটি উত্তর দিল, আমরা অযোধ্যার রাজা দশরথের ছেলে। ইনি রামচন্দ্র। আমি লক্ষ্মণ। আমরা এখন বনবাসী।

ভিখারীর বেশে হনুমান আবার জিজ্ঞেস করল, রাজ্য ছেড়ে আপনাদের বনে আসার কারণ কি?

এবার লক্ষ্মণ জানালেন, পিতার প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্য রামচন্দ্র এসেছেন বনে। সঙ্গে এসেছিলেন স্ত্রী সীতা। পঞ্চবটী বনে আমরা কুঁড়েঘর বেঁধে বাস করছিলাম। একদিন আমাদের আশ্রমে না থাকার সুযোগে লঙ্কার রাজা রাক্ষস রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। সীতার খোঁজে তাই আমরা বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

হনুমান হাত জোড় করে রামের দিকে চেয়ে বললে, প্রভু এখানে বাস করেন কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালীর ভাই। বালী তাঁকে মিছামিছি সন্দেহ করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আপনি তার কাছে চলুন। তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।

হনুমানের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ এলেন সুগ্রীবের কাছে। সব কথা শুনে সুগ্রীব রামচন্দ্রকে বললে, আমি জানি লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করেছে। তোমরা যদি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর, আমাকে সাহায্য কর, তাহলে আমি সীতাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করব।

রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, সুগ্রীব, তুমি আমার বন্ধু। আমিও তোমাকে সাহায্য করব, কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে তোমাকে বসাব।

সুগ্রীব গুহার ভেতর থেকে নিয়ে এল সীতার ফেলে দেওয়া গায়ের গয়না, পায়ের নূপুর আর মাথার ওড়না। রাম-লক্ষ্মণ সীতার ওড়না আর গয়না দেখে শোকে অধীর হয়ে উঠলেন।

সুগ্রীব বললে, রামচন্দ্র, এখন শোকের সময় নয়। সামনে আমাদের অনেক কাজ। আমার যদি শক্তি বাড়ে, যদি আমি কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্য পাই, তবে সমস্ত বানর সৈন্য আমি সীতা-উদ্ধারের কাজে লাগাতে পারব।

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন, তোমার কাজই আমি আগে করব।

সুগ্রীব বললে, বালী মহাবীর। তাকে জয় করা সহজ নয়।

রামচন্দ্র বললেন, সুগ্রীব, তুমি নির্ভয়ে থাক। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য তোমাকে আমি উদ্ধার করে দেবই।

পরামর্শ-সভা বসল। সভায় স্থির হ'ল, কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে সুগ্রীব বালীকে যুদ্ধে অহ্বান করবে। সুগ্রীবের হনুমান, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ প্রভৃতি অনুচরগণ লুকিয়ে থাকবে বনে।

রামচন্দ্র তীরধনুক নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন। দরকার হলে তিনি তীর দিয়ে বালীকে বধ করবেন।

সুগ্রীব গিয়ে হানা দিল কিষ্কিন্ধ্যায়। প্রচণ্ড গর্জনে সে বালীকে যুদ্ধ করবার জন্য ডাক দিল। বালী রাগে ফেটে পড়ল। সে গর্জে উঠে সুগ্রীবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করে সুগ্রীব পারবে কেন? কিল, চড়, ঘুষি খেয়ে সে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ল।

রামচন্দ্র বুঝতে পারলেন সুগ্রীব বালীর কাছে হেরে যাচ্ছে। তিনি তীর-ধনুক দিয়ে প্রস্তুত। কিন্তু তীর ছুঁড়তে পারছেন না। দু'জনের চেহারাই এক রকম। কে বালী আর কেই বা সুগ্রীব দূর থেকে চেনা যায় না। তীর ছুঁড়ে শেষ পর্যন্ত বন্ধুহত্যার পাপের ভাগী হবেন!

এদিকে যুদ্ধে হেরে গিয়ে ফিরে এল সুগ্রীব।

সুগ্রীবকে আশ্বাস দিয়ে রামচন্দ্র বললেন, বন্ধু, আমাকে ভুল বুঝো না। তোমাদের দু'ভায়ের চেহারাই এক রকমের। তাই আমি নির্ভয়ে তীর ছুঁড়তে পারিনি। এবার যাতে আর ভুল না হয়, তার ব্যবস্থা আমি করছি।

ঋষ্যমূক পর্বতের ওপর ছিল গজপুষ্পের গাছ। তিনি লক্ষ্মণকে সেই গাছ থেকে ফুল তুলে নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন। ফুল নিয়ে এলেন লক্ষ্মণ। ফুলের মালা গেঁথে রামচন্দ্র সুগ্রীবের গলায় পরিয়ে দিলেন, বললেন, এবার তুমি যাও, সুগ্রীব। অত্যাচারী বালীর মৃত্যুর আর বেশী দেরি নেই।

সুগ্রীব আবার এসে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করল।

অবাক্ হ'ল বালী।

মন্ত্রীরা বললে, মহারাজ, আর যুদ্ধে কাজ নেই। শত্রু হেরে গিয়ে আবার যদি যুদ্ধ করতে ফিরে আসে, সে হয় ভয়ঙ্কর। আপনি আর যুদ্ধ করবেন না। ভায়ে-ভায়ে যে যুদ্ধ হয়, তার ফল ভাল নয়। আর তা ছাড়া, আর একটা ভাববার কথাও আছে।

রাগে বালীর চোখ দুটো লাল হয়ে উঠল প্রশ্ন করল, কি কথা?

প্রধান মন্ত্রী বললে, শুনেছি, অযোধ্যা থেকে রাজা দশরথের ছেলে রাম-লক্ষ্মণ এসেছেন এই বনে। সুগ্রীব যদি তাঁদের সাহায্য পায়, তবে তাঁরাও হবেন আপনার শত্রু।

অহংকারী বালী উত্তর দিল, সুগ্রীব ক্ষমার যোগ্য নয়। তাকে বধ না করা পর্যন্ত আমার মনে শান্তি নেই। আমি জানি রামচন্দ্র ধার্মিক। তিনি কোন অধর্মের কাজ করবেন না। আর তা ছাড়া, তাঁর সঙ্গে তো আমার কোন বিরোধ নেই। আমি সুগ্রীবকে উচিত শিক্ষা দেব।

আবার, দু'ভাই যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। আরম্ভ হ'ল যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধে সুগ্রীব ক্রমে হীনবল হয়ে পড়ল। তার প্রাণ যায়-যায়।

রামচন্দ্র বুঝলেন, আর দেরী করলে সুগ্রীবের হবে জীবন-সংশয়। তিনি ধনুকে তীর বসিয়ে ছুঁড়ে দিলেন বালীর দিকে।

বালীর বুকে বিঁধল সেই তীর। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালী মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

রাম ও লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে বালীর কাছে এসে দাঁড়ালেন।

বালী দেখতে লাগল রামচন্দ্রকে। খানিকক্ষণ সে চুপ করে রইল, তারপর বলতে লাগল, রামচন্দ্র, আমি তোমার কাছে কোন অপরাধ করিনি। তবে কেন আমাকে হত্যা করলে? আমি জানতাম, তুমি ধার্মিক। এ কি ধর্মের কাজ?

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন, বালী, তোমার অপরাধ গুরুতর। সুগ্রীব তোমার ছোট ভাই। সে তোমার পরম ভক্ত। অথচ বিনা কারণে তুমি তাহাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ। তাই ধর্মের কথা তোমার মুখে শোভা পায় না। তোমার উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে, বালী। ভায়ে ভায়ে ঝগড়ার এই পরিণাম।

বালীর চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। সে সুগ্রীবের দিকে চেয়ে বলে উঠল, ভাই সুগ্রীব, আমাকে ক্ষমা কর। রাজ্যের লোভে, শক্তির অহংকারে, ভুল বুঝে আমি তোমার প্রতি অন্যায় করেছিলাম, তার ফল আমি পেলাম। আমার আর কিছু বলবার নেই। তুমি কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্য ভোগ কর।

সুগ্রীব এবার শিশুর মত কেঁদে উঠল। দাদার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বললে, দাদা, তুমিও আমাকে ক্ষমা কর।

বালী এবার রামচন্দ্রকে কাছে আসতে অনুরোধ করল। তারপর ডানহাত দিয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে বললে, রামচন্দ্র, সীতাকে রাবণ হরণ করেছে, তা আমি জানি। আমাকে জানালে আমি

১। সুগ্রীব বলল, ভেবেছিলাম তুমি বেঁচে নাই।

২। কিন্তু বালীর বিশ্বাস হ'ল না, তাই সুগ্রীবকে তাড়িয়ে দিল।

৩। সুগ্রীব সীতার-ফেলে দেওয়া জিনিস যত্ন করে রেখে দিল।

৪। সুগ্রীব রামচন্দ্রকে সেগুলো দেখিয়ে বললে, এখন শোকের সময় নয়।

তাঁকে উদ্ধার করে আনতে পারতাম। ভাগ্যদোষে তা আর হ'ল না। তবুও আমার সান্ত্বনা তোমার হাতে আমার মৃত্যু হ'ল।

রামচন্দ্র বললেন, বালী, তুমি দিব্যলোকে যাও।

বালীর দেহ, কেঁপে উঠল। সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল।

সুগ্রীব এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললে, রামচন্দ্র, আমার প্রাণ আমি আর রাখতে চাই না, চাই না রাজ্য, চাই না ঐশ্বর্য। তুমি যে বাণে দাদাকে হত্যা করেছ, আমাকেও সে বাণ দিয়ে বধ কর।

রামচন্দ্র তাকে প্রবোধ দিতে দিতে বললেন, সুগ্রীব, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যাচ্ছ। আমার প্রতিজ্ঞা আমি পালন করেছি। এবার তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর। বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা কর। সীতা-উদ্ধারের ব্যবস্থা কর।

সুগ্রীব আর কোনো কথা বললে না। চুপ করে রইল।

রামচন্দ্রের আদেশে নদীর তীরে চিতা সাজান হ'ল। বালীর মৃতদেহ তার ওপর তুলে দিয়ে আগুন দেওয়া হ'ল।

চিতার দিকে চেয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল সুগ্রীব। রাম-লক্ষ্মণের চোখেও এল জল।

———

সীতার সন্ধানে হনুমান

কিষ্কিন্ধ্যারাজ সুগ্রীবের আদেশে লাফিয়ে হাজার যোজন চওড়া সাগর পার হয়ে হনুমান এল লঙ্কায়। বিরাট লঙ্কাপুরী দেখে সে অবাক্ হ'ল। এই বিশাল পুরীতে সে সীতাদেবীকে কোথায় খুঁজে পাবে? আর তাঁকে কেমন করেই বা সে চিনতে পারবে? সে কখনো তাঁকে চোখে দেখেনি। তবুও সে ফিরে গেল না। কি ভাবে কাজ করতে হবে, এক মুহূর্তে সে ঠিক করে ফেলল।

হনুমান মায়াবী। নিজের শরীরকে ছোট করে প্রবেশ করল লঙ্কাপুরীতে।

তখন সন্ধ্যাকাল। তবুও অন্ধকার নেই। হাজার হাজার দীপের আলোয় আলোময় লঙ্কাপুরী। ঘরে ঘরে রয়েছে সোনার দুয়ার, বৈদুর্য মণির সিঁড়ি। দুয়ারের সোনা আর সিঁড়ির মণি এই আলোয় ঝকমক করছে। উঁচু উঁচু সব বাড়ী, মনে হয় যেন আকাশ ছুঁয়ে আছে। পুরীর মধ্যে অনেক পথ, অনেক পুকুর, অনেক উদ্যান। পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে অস্ত্রধারী রাক্ষসের দল, দুয়ারে দুয়ারে রয়েছে ভয়ঙ্কর চেহারার সব দ্বারপাল। পথে পথে ভীড়। ঘরে ঘরে নাচ-গান চলছে, উঠছে আনন্দের কলধ্বনি উঁকি দিয়ে দেখে দেখে পথ চলছে হনুমান। সুবেশা সব নারী, সুবেশ সব রাক্ষস। আনন্দে আর কোলাহলে সবাই মত্ত।

হনুমান ভাবল, সীতা সতী এখানে থাকতে পারেন না। এমন হৈ-হুল্লোলের মধ্যে তাঁর বাস করা সম্ভব নয়। হয় তিনি স্বামীর শোকে মারা গেছেন, নয়ত লঙ্কার এমন স্থানে আছেন যেখানে একমাত্র রাবণ ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না।

হনুমান লঙ্কার প্রতিটি স্থান খুঁজে বেড়াল। সে দেখল, রাবণের অন্তঃপুর, অন্তপুরের প্রতিটি ঘর, অন্তঃপুরের উদ্যান, সরোবর প্রভৃতি। কিন্তু কোথাও সীতা নেই!

লঙ্কাপুরীর একপ্রান্তে অশোকবন, উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। ভেতরে কি আছে, তা দেখা যায় না। হনুমান দেওয়ালের ওপর লাফিয়ে উঠল। সতর্ক হয়ে চেয়ে দেখতে লাগল চারদিক। সুযোগ বুঝে সে একটা শিশুগাছের ওপর লাফিয়ে পড়ল। সামান্য একটু শব্দ হ'ল। শিশু গাছের কয়েকটা পাতা খসে পড়ে গেল। ঘন পাতার আড়ালে বসে চারদিক চেয়ে চেয়ে সে দেখতে দেখতে। এমন সময় তার চোখে পড়ল—এক গাছের নীচে বসে আছে এক অপূর্বসুন্দরী রমণী। তাঁর চারদিকে রয়েছে রাক্ষসীর দল। রমণীর দেহ কৃশ, রূপ ধোঁয়ার ঢাকা আগুনের শিখার মত, পরনে ময়লা হলদে শাড়ী। তাঁর চোখে জল, মুখ মলিন। তিনি বারে বারে ফেলছেন দীর্ঘশ্বাস।

হনুমানের মনে হ'ল ইনিই সীতা। কারণ, যে সব গয়নার কথা রামচন্দ্র বলেছিলেন, সে সব এঁর অঙ্গে আছে। অন্য গয়না আর ওড়না যা ইনি ফেলে দিয়েছেন, তা নেই।

ইতিমধ্যে অশোক বনে এল রাবণ। সে সীতাকে তিরস্কার

করে চলে গেল। রাক্ষসীরাও সীতাকে নানা দুর্বাক্য বলে বিশ্রামের জন্য অন্য জায়গায় চলে গেল। হনুমান বুঝতে পারল সীতার সঙ্গে কথা বলবার এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। তবে হঠাৎ সীতার কাছে যাওয়া ঠিক নয়। তিনি ভয় পেতে পারেন। ভয়ে চীৎকার করে উঠলে রাক্ষসীরা হয়ত ছুটে আসবে। এই ভেবে হনুমান গাছের ওপর বসেই রামচন্দ্রের গুণগান আরম্ভ করল।

ইক্ষ্বাকু বংশের কীর্তিমান রাজা দশরথ। রামচন্দ্র তাঁর বড় ছেলে। পিতার প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য সীতা আর লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে এলেন বনে। জনস্থানের বহু রাক্ষস তিনি বধ করলেন। তাতে রাবণের হ'ল রাগ। সে মায়ামৃগের সাহায্যে সীতাকে হরণ করে নিয়ে এল। সীতার খোঁজ করতে গিয়ে রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হ'ল বনরাজ সুগ্রীবের। দু'জনের হ'ল বন্ধুত্ব। সুগ্রীব বন্ধুকে সাহায্য করবার জন্য সীতার খোঁজে নানা দিকে বানর-চর পাঠিয়েছেন। আমি সুগ্রীবের চর হনুমান। সংবাদ পেয়ে সাগর ডিঙিয়ে আমি এসেছি লঙ্কায়। সীতার যে রূপের কথা লক্ষ্মণ আর রামচন্দ্রের মুখে শুনেছি, তাতে মনে হয় আমি সীতার দেখা পেয়েছি।

হনুমানের গলার স্বর শুনে চমকে উঠলেন সীতা। তিনি চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। গাছের ডালে শেষ পর্যন্ত দেখতে পেলেন হনুমানকে—উঠন্ত সূর্যের মত সুন্দর, গায়ের রং অশোক ফুলের মত, চোখ সোনার বরণ, পরনে সাদা কাপড়।

সীতার চোখ তার দিকে পড়তেই গাছ থেকে নেমে এল হনুমান। সীতাকে প্রণাম করে বললে, মা, আপনি কে ? কেন কাঁদছেন ? কে আপনার পিতা, কে আপনার শ্বশুর, কে আপনার স্বামী ? আপনাকে দেখে আমার মনে হয় আপনি রাজকন্যা ও রাজরানী। রাবণ যাকে জনস্থান থেকে হরণ করে নিয়ে এসেছে, আপনি যদি সে সীতাই হন, তাহলে আমার কথার উত্তর দিন।

সীতা চোখের জল মুছলেন। খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন হনুমানের দিকে, তারপর বললেন, আমি দশরথের পুত্রবধূ, জনকের কন্যা, রামচন্দ্রের স্ত্রী। রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে এসেছে।

হনুমান সীতাকে আবার প্রণাম করে বললে, দেবি, আমি রামচন্দ্রের কাছ থেকেই এসেছি। তিনি কুশলে আছেন। আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। লক্ষ্মণ তাঁর প্রণাম আপনাকে জানিয়েছেন।

হনুমান এবার আরও এগিয়ে এসে সীতার কাছে বসল। সীতা মনে মনে ভয় পেয়ে বললেন, তুমি যদি মায়াবী রাবণ হও, তা হলে তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাও। ভিখারীর বেশে আমাকে হরণ করে আমার স্বামীর কাছ থেকে দূরে নিয়ে এসেছ। যাঁর সঙ্গ ত্যাগ করা সম্ভব নয় বলে আমি বনে এসেছিলাম, সে স্বামীকে ছেড়ে আমি লঙ্কায় বাস করছি। আমার দুঃখ আমি ভোগ করছি। কেন মিথ্যা বলে আমার দুঃখ বাড়িয়ে তুলছ।

হনুমান সীতার দুঃখের কথা শুনে মাথা নিচু করে বসে রইল, তার মুখ দিয়ে কোন কথা বার হ'ল না।

সীতা আবার বললেন, তুমি যদি রামের দূত হয়েই এসে থাক, তা হলে তোমার মঙ্গল হোক। তোমার কথায় আমার মন অস্থির হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না, এ স্বপ্ন না সত্য।

হনুমান এবার উত্তর দিল, দেবি, আমি রামের দূত। আমাকে সন্দেহ করবেন না। আমার কথায় বিশ্বাস করুন।

সীতা বলিলেন, রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হ'ল? রাম-লক্ষ্মণের কথা আমায় বল।

হনুমান রাম-লক্ষ্মণের রূপ বর্ণনা করে সীতাহরণের পরের ঘটনাগুলো উল্লেখ করল। তারপর বললে, মা, আপনার ভয় নেই। আপনি কি চান আর আমায় কি করতে হবে, তা বলুন। আপনার বিশ্বাস জন্মাবার জন্য আমি রামচন্দ্রের নামলেখা আংটি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এই দেখুন।

সীতা দেখলেন রামচন্দ্রের আংটি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ হ'ল উজ্জ্বল। তিনি হনুমানকে বললেন, হনুমান, তুমি মহাবীর। তা নইলে এত বড় সাগর পার হয়ে লঙ্কায় আসতে পারতে না। তুমি সামান্য নও। রাবণকেও তোমার ভয় নেই। রাম যদি নিরাপদেই থাকেন, তবে তিনি লঙ্কা পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছেন না কেন? আমার উদ্ধারের জন্য তিনি চেষ্টা করছেন তো? আমি দেখতে পাব যে, রামচন্দ্র সসৈন্যে লঙ্কায় এসে দুরাত্মা রাবণকে বধ করেছেন? মহাবীর হনুমান, আমার

মত তাঁর স্নেহের পাত্রী আর কেউ নেই। এজন্যই আজ পর্যন্ত আমি বেঁচে আছি।

হনুমান উত্তর দিল, দে ব, আমি ফিরে গিয়ে আপনার সংবাদ জানালেই বহু সৈন্য নিয়ে রামচন্দ্র লঙ্কা আক্রমণ করবেন, রাক্ষস-শূন্য করবেন লঙ্কাপুরী। আবার আপনার সঙ্গে তাঁর মিলন হবে। আপনি কাছে না থাকায় রামচন্দ্র শোকে মগ্ন। তিনি সব রকম বিলাস ত্যাগ করেছেন। কেবল ফলমূল খেয়ে বেঁচে আছেন। তিনি আপনার ধ্যানেই বিভোর।

সীতা বলিলেন, হনুমান, আজ দশমাস আমি লঙ্কায় বন্দিনী। আর দু'মাস মাত্র আমি বেঁচে থাকব। পাপিষ্ঠ রাবণ ছলে, বলে আমাকে পেতে চায়। সে কারো উপদেশ শুনবে না।

হনুমান উত্তর দিল, দেবি, আপনি যদি রাজী হন, তাহলে আজিই পিঠে করে আপনাকে উদ্ধার করে নিয়ে রামচন্দ্রের কাছে চলে যেতে পারি।

সীতা মনে মনে খুশি হয়ে বললেন, হনুমান, তুমি তো একটা ক্ষুদ্র জীব। আমাকে কি করে নিয়ে যাবে ?

সীতার কথায় দুঃখিত হ'ল হনুমান। কিন্তু কোন উত্তর দিল না। সে উঠে দাঁড়াল। সীতার বিশ্বাস জন্মাবার জন্য ক্রমে সে বড় হতে লাগল। তার দেহ হ'ল বিশাল পর্বতের মত।

হনুমান বললে, দেবি, এবার বোধ হয়, আমার শক্তি-সম্বন্ধে আপনার কোন সন্দেহ নেই। আপনি আমার সঙ্গে চলুন। রামচন্দ্রের শোক দূর করুন।

সীতা উত্তর দিলেন, হনুমান, তোমার শক্তি আছে বিশ্বাস করি। কিন্তু রাক্ষসরা যদি আক্রমণ করে, তখন একা তুমি কি করবে ? যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কথা বলা যায় না। আর যদি জয়ীই হও, আমাকে যদি এভাবে নিয়ে যাও, তা হলে রামচন্দ্রের বীর নামে রটবে কলঙ্ক। তুমি আমার সংবাদ নিয়ে ফিরে যাও। তাতেই ফল ভাল হবে। আমি অন্য পুরুষকে স্পর্শ করতে চাই না। তাই তোমার সঙ্গে যেতে পারি না। রাবণ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার দেহ স্পর্শ করেছিল। তার উচিত সাজা সে পাবে। রাক্ষসদের বধ করে যদি রামচন্দ্র আমাকে উদ্ধার করেন, তবে তাঁর যোগ্য কাজ হবে।

হনুমান বললেন, দেবি, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, আমার সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই। আমি ফিরেই যাই। যাবার আগে আপনার কাছে এমন নিদর্শন প্রার্থনা করি, যাতে রামচন্দ্রের বিশ্বাস হয় যে, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করেছি।

এই কথা শুনে সীতা তার কাপড় থেকে একটি রত্ন বার করে বললেন, রামচন্দ্রকে এটি দিও, তিনি এই নিদর্শন চেনেন। ওঁ দেখলে তাঁর তিনজনকে মনে পড়বে—আমাকে, মাতা কৌশল্যাকে এবং পিতা দশরথকে।

হনুমান হাত পেতে নিল মণি, বললে, দেবি, আপনি আশ্বস্ত হোন। রামচন্দ্র শীঘ্রই আসবেন লঙ্কায়। তাঁর সঙ্গে আসবেন সুগ্রীব। আপনার রাক্ষসের দেশে বাস করার দিন শেষ হয়ে আসছে। এই কথা বলে হনুমান সীতাকে প্রণাম করল।

সীতার সন্ধানে হনুমান

১। হনুমান মায়াবী। নিজ শরীরকে সঙ্কুচিত করে সে প্রবেশ করল লঙ্কাপুরীতে।
২। হনুমান খুঁজল অন্তঃপুরে প্রতিটি ঘর। কিন্তু সীতা কোথাও নেই।
৩। হনুমান দেখল, সীতার সঙ্গে কথা বলবার এই সুযোগ।
৪। হনুমান বললে, এই দেখুন, আমি রামচন্দ্রের নাম-লেখা আংটি এনেছি।

সীতা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হনুমান, তুমি যাও। আমার কথা রাম-লক্ষ্মণকে বলো। আর বলো সুগ্রীবকে। আমি যে দুঃখের সাগরে পড়েছি, তা থেকে আমাকে তাঁরা শীঘ্রই যেন উদ্ধার করেন।

হনুমান বললে, দেবি, আমি ফিরে যাব। কিন্তু যাবার আগে আমার শক্তি আপনি দেখুন। তা হলেই বুঝবেন, লঙ্কাপুরীর কি দশা হবে।

এই বলে বিশাল দেহ ধারণ করে লাফিয়ে উঠল হনুমান। ধ্বংস করতে লাগল সুন্দর অশোক বন।

রাক্ষসীরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারা উঠল জেগে। ব্যাপার দেখে তারা অবাক্ হ'ল। সংবাদ গেল রাবণের কাছে, এক বানর নষ্ট করছে অশোকবন।

রাগে জ্বলে উঠল রাবণ। রাক্ষসদের আদেশ দিল বানরকে বন্দী করার জন্য। যুদ্ধে রাক্ষসরা হেরে গেল। হনুমান শেষ পর্যন্ত লঙ্কাপুরী পুড়িয়ে ফিরে এল সীতার কাছে। সীতা হনুমানকে আশীর্বাদ করলেন।

সীতাকে প্রণাম করে হনুমান লাফ দিয়ে এসে পড়ল অরিষ্ট পর্বতের ওপর। দশ যোজন লম্বা আর ত্রিশ যোজন উঁচু পর্বত। হনুমানের পায়ের ভরে তা কাঁপতে লাগল। সাগর পার হবার জন্য সে পর্বত থেকে আবার লাফ দিয়ে উঠল আকাশে।

———

সীতা ও সরমা

লঙ্কার অশোকবনে বসে আছেন সীতা। রাবণ তাঁকে অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে পারেনি। ভয় দেখিয়ে তাঁকে হাত করতে পারেনি। রাবণের আদেশে অশোকবনে সীতাকে রাতদিন ঘিরে বসে আছে রাক্ষসীর দল। তারা কেবল পাহারা দেয়। কিন্তু দেয় না ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণার জল। নানা অত্যাচারে তাঁকে জর্জরিত করে তোলে। রামের নাম স্মরণ করে তিনি কেবল কাঁদেন, আর ব্যাকুল হয়ে ওঠেন নিজের মুক্তির জন্য।

এই শত্রুপুরীতে বিভীষণের স্ত্রী সরমাই একমাত্র সীতার সাথী। তিনি তাঁর দুঃখ বুঝতে পারেন, মধুর কথায় তাঁকে ভোলান। কিন্তু প্রতিদিন তিনি অশোকবনে আসতে পারেন না। রাক্ষসীরা যখন পাহারায় থাকে না, তখন তিনি গোপনে সীতার সঙ্গে দেখা করেন। সীতা সরমাকে মনের কথা খুলে বলেন। দু'জনেই চোখের জল ফেলেন।

লঙ্কার খবর সীতা সরমার কছেই পান। সেদিনও সরমা এসেছেন। সীতার কাছে বসে তিনি বলেন, সীতা, তোমার দুঃখের দিন শেষ হয়ে এসেছে। রামচন্দ্র লঙ্কায় এসেছেন, রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হবার আর বেশি দেরি নেই।

সীতার মন আনন্দে ভরে গেল। তিনি অনুরোধ করলেন, সরমা, আমায় সব কথা খুলে বল।

সরমা বললেন, সীতা, মানুষ যা পারে না, রামচন্দ্র তাই করেছেন। সমুদ্রের জলে তিনি শিলা ভাসিয়াছেন, মহাসমুদ্রে বেঁধে ফেলেছেন। রাম-লক্ষ্মণের বানর সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আগামী কাল কি হয় বলা যায় না।

সীতা খুশি হয়ে আবার প্রশ্ন করলেন, সরমা, রাবণকে সুবুদ্ধি দেয়, এমন কি কেউ লঙ্কায় নেই ?

সরমা উত্তর দিলেন, মৃত্যুকালে মানুষের উল্‌টো বুদ্ধি হয়। সে কারো কথা শোনে না। কৃপণ যেমন বেঁচে থেকে ধন ছাড়তে পারে না, রাবণও তেমনি যুদ্ধ না করে তোমাকে ছেড়ে দেবে না। আমার স্বামী রাবণকে রামচন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়া করতে বারণ করেছিলেন, বারবার বলেছিলেন তোমাকে ফিরিয়ে দিতে। রাবণ শোনেনি। তাঁকে অপমান করে লঙ্কা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। রাবণের মা এবং প্রধান মন্ত্রিগণও একই উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের কথায়ও কোন কাজ হয়নি। লঙ্কায় যুদ্ধ হবেই।

সীতা বললেন, তোমাকে আমি নিজের বোনের মত মনে করি। তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করি, আমি রাবণের কাছে তো কোন অপরাধ করিনি। রামচন্দ্রও রাবণের শত্রু ছিলেন না। তবুও কেন বিনা দোষে আমার দুর্গতি ?

সরমা উত্তর দিলেন, সীতা, তোমার কোন দোষ নেই। দোষ নেই রামচন্দ্রের। রাবণের বোন নাক-কান-কাটা শূর্পণখা তোমাকে হরণ করবার জন্য রাবণকে উত্তেজিত করেছিল। সখি, তুমি নিমিত্ত মাত্র। অহংকারী লঙ্কার রাজা রাবণ

সবংশে মরবে, এই ছিল তার কপালের লেখা। এই ছিল তার শাপ।

সীতা প্রশ্ন করলেন, সরমা, এ শাপের কারণ ?

সরমা উত্তর দিলেন, আমি শুনেছি, রাবণের প্রথম জীবনের কথা। ব্রহ্মার বরে সে হ'ল অজেয়। দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, সর্প কেউই তার কিছু করতে পারবে না। নর বা বানরকে সে তুচ্ছ করেছিল। তাদের কথা মনেও হয়নি তার। ব্রহ্মার বরে মত্ত হয়ে সে একবার গেল কৈলাসে, দেখা করতে চাইল মহাদেবের সঙ্গে। মহাদেবের সঙ্গী নন্দী বাধা দিল। রাবণ তাকে বানর বলে গাল দেয়। রাগে নন্দী শাপ দিয়েছিল, বানররাই তোর সর্বনাশ করবে, তোর বংশ ধ্বংস করবে। তার লক্ষণও দেখতে পাচ্ছি। সীতা, তুমি তো জান, অহংকার লোককে বিপথে নিয়ে যায়। অহংকারীর ধর্ম ও অধর্মের জ্ঞান থাকে না। ক্ষমতার মোহে অধর্মের প্রতি তার ঝোঁক বেশি হয়। রাবণও চলেছে এই অধর্মের পথে।

সরমা তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না। লঙ্কায় তুমুল কোলাহল আরম্ভ হ'ল। যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠল। লঙ্কা কেঁপে উঠল, কেঁপে উঠল লঙ্কার পর্বত, সাগর।

শব্দ শুনে সীতার বুক কেঁপে উঠল। ভয়ে জড়সড় হয়ে তিনি সরমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

সরমা বললেন, সখি, যুদ্ধের জন্য রাবণ প্রস্তুত হচ্ছে। রাক্ষস সৈন্য বাজাচ্ছে যুদ্ধের বাজনা। আমি একবার অন্তঃপুরে

যাচ্ছি, দেখে আসি ব্যাপার। ফিরে এসে তোমাকে সব বলব।

অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে সরমা সীতাকে বললেন, রানী মন্দোদরী রাবণকে যুদ্ধ করতে বারণ করছেন, অনুরোধ করছেন তোমাকে ফিরিয়ে দিতে। তিনি বলছেন, রাম-লক্ষ্মণ দু'জনেই মহাবীর। যুদ্ধে কোন লাভ হবে না। যিনি পূর্বে একা দণ্ডক-বনে চোদ্দ হাজার রাক্ষসকে বধ করেছেন, তিনি সামান্য মানুষ নন। যিনি একবাণে বালীকে হত্যা করেছেন, বধ করেছেন কবন্ধ ও মারীচকে, তিনি মানুষ নন, নররূপী দেবতা। এখনো সময় আছে, সীতাকে ফিরে পেলে রামচন্দ্র আর যুদ্ধ করবেন না।

সীতা প্রশ্ন করলেন, রাবণ কি বললে, সরমা ?

সরমা উত্তর দিলেন, রাবণ বললে, জীবন থাকতেও সে তোমাকে ফিরে দিতে পারবে না, নত হতে পারবে না রামচন্দ্রের কাছে, যুদ্ধে নর আর বানরকে সে ভয় করে না।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন সীতা। কোথায় অযোধ্যা আর কোথায় লঙ্কা! পিতৃ-সত্য রক্ষা করবার জন্য রামচন্দ্র এলেন বনে। রাজকুমার হলেন বনবাসী ব্রহ্মচারী। তিনি বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। রাজভোগ যাঁর দেহ পোষণ করত, তিনি ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করতে লাগলেন। যাঁর আবাস ছিল প্রাসাদ, তিনি বাস করতে

লাগলেন পাতার কুটীরে। তারপর এল এক দুর্যোগ। এক সোনার হরিণ এল কুটীরের কাছে। সীতাকে খুশি করবার জন্য হরিণের পেছনে ছুটে গেলেন রাম-লক্ষ্মণ। রাবণের কথা মনে করতেই শিউরে উঠলেন সীতা। তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। চোখে এল জল।

সীতার চোখে জল দেখে সরমা বললেন, সীতা তুমি দুঃখ করো না। অন্যায় যে করে সে অন্যায়ের ফল ভোগ তাকে করতে হয়। তোমাকে হরণ করতে গিয়ে রাবণের একবারও মনে হয়নি যে, যে কালসাপ ধরে নিয়ে যাচ্ছে, সেই সাপের কামড়েই হবে তার মৃত্যু। আজই এই মৃত্যুর ছায়া পড়েছে সমস্ত লঙ্কায়। সখি, তুমি চোখের জল মুছে ফেল। আমি তোমাকে প্রতিদিনের যুদ্ধের খবর বলে যাব।

লঙ্কায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। সীতা সরমার মুখে শুনতে লাগলেন যুদ্ধের খবর।

লঙ্কায় যুদ্ধ তুমুল হয়ে উঠেছে। হাজার হাজার বানর আর রাক্ষস সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ দিচ্ছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বইছে রক্তের নদী। অস্ত্রের শব্দ ভাসছে আকাশে, বাতাসে। সৈন্যগণের কোলাহলে, আহতের কাতর চিৎকারে কাঁপছে লঙ্কাপুরী।

ক্রমে যুদ্ধে মারা যেতে লাগল বীর রাক্ষস-সেনাপতিরা। হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধে মারা গেল ধূম্রাক্ষ ও অকম্পন। বানর সেনাপতি নীল নিহত করল রাক্ষস-সেনাপতি প্রহস্তকে।

মনে মনে আঁতকে উঠল রাবণ। মন্ত্রিগণের মনেও জয়ের আশা আর নেই। তারা রাবণকে যুদ্ধ বন্ধ করতে অনুরোধ করল। সন্ধির প্রস্তাব করবার জন্য পরামর্শ দিল।

কিন্তু মনের ভয় রাবণ মুখে প্রকাশ করল না। ধমকে সবাইকে থামিয়ে দিল। রাক্ষস-সৈন্যদের উৎসাহিত করবার জন্য রাবণ নিজেই হ'ল সেনাপতি।

রাবণ যুদ্ধে আসছে শুনে বানর সৈন্যদের মধ্যে উত্তেজনার সাড়া পড়ে গেল।

রাবণের পরাক্রমে দলে দলে বানর সৈন্য বিধ্বস্ত হতে লাগল। বানর-সেনাপতিরা একে একে হঠে এল। এমন সময় রামচন্দ্র এলেন যুদ্ধে। তিনি রাবণকে আক্রমণ করলেন। বাণ দিয়ে কেটে তিনি রাবণের রথের ঘোড়া মেরে ফেললেন, কেটে দিলেন রথের ধ্বজা ও পতাকা, সাদা ছাতা, সোনার দণ্ড আর চাকা। তারপর তিনি ছুঁড়লেন বজ্রের মত বাণ। বাণ গিয়ে দশানন রাবণের বুকে বিঁধল। ব্যথায় বিচলিত হ'ল রাবণ। তার হাত থেকে ধনু খসে পড়ল। এই অবসরে রামচন্দ্র রাবণের মাথার রাজমুকুট বাণ দিয়ে কেটে ফেললেন।

রাবণ অজেয়। কিন্তু আজ তার মাথায় নেই মুকুট, যুদ্ধের পোশাক ছিন্নভিন্ন। সে আজ বিষশূন্য সাপ, মেঘে ঢাকা সূর্যের মত তেজোহীন, দীপ্তিহীন।

রাবণের অবস্থা দেখে মহামতি রামচন্দ্র বললেন, রাবণ, আজ তোমাকে আমি ছেড়ে দিলাম। ফিরে যাও অন্তঃপুরে।

তবে তোমাকে আমি জানাই, তোমার নিস্তার নেই। তুমি যে কাজ করেছ, তার ফল তুমি পাবে।

রাবণ মাথা নিচু করে যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে চলে গেল।

মন্ত্রিগণকে ডেকে রাবণ বললে, আমি কোনদিন ভাবিনি, কোন নর বা বানর আমাকে পরাজিত করতে পারবে। মহাদেবের বরে আমি দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ রাক্ষস ও সর্পের অবধ্য। কিন্তু নর বা বানর-সম্বন্ধে আমি কোন বর চাইনি। এখন দেখছি, মানুষের কাছেই হ'ল আমার পরাজয়। আমার এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারে, একমাত্র আমার ভাই কুম্ভকর্ণ। কুম্ভকর্ণ এখন ঘুমিয়ে আছে। কুম্ভকর্ণের ঘুম চলে একটানা সাত-আট-ন'মাস, কখনো বা দশমাস। সহজভাবে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলে কুম্ভকর্ণ অজেয়। তবে লঙ্কার প্রয়োজনে অসময়ে তার ঘুম ভাঙাতে হবে। তোমরা তার ঘুম ভাঙানোর ব্যবস্থা কর। কুম্ভকর্ণ রাম-লক্ষ্মণকে বধ করবে।

কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবে কে? কি ভাবেই বা তাকে জাগানো যাবে? সময় না হলে সে জাগবে না। কেউ তাকে জাগাতে পারবে না। কিন্তু রাজার আদেশ, তাকে জাগাতেই হবে। বহু রাক্ষস একসঙ্গে গেল কুম্ভকর্ণের বাড়ী।

পাহাড়ের মত বিরাট এক রাক্ষস শুয়ে আছে। নাকের নিশ্বাসে ঝড়ের বেগ। কাছে দাঁড়াবার কারো সাধ্য নেই। অতি কষ্টে পা মাটীতে রেখে, সকল রাক্ষস একসঙ্গে ডাকাডাকি

আরম্ভ করল। মনে হ'ল, একসঙ্গে আকাশের সমস্ত মেঘ গর্জন করে উঠল। তবুও ঘুম ভাঙল না কুম্ভকর্ণের।

এবার কুম্ভকর্ণের কানের কাছে হাজার হাজার শাঁক বেজে উঠল। বাজল মৃদঙ্গ, ভেরী প্রভৃতি নানা রকম বাজনা। কুম্ভকর্ণ জাগল না। যেমন ঘুমচ্ছিল তেমনি নিশ্চিন্তমনে ঘুমতে লাগল। এবার তার দেহের ওপর চালিয়ে দেওয়া হ'ল, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তু! তাতেও যখন তার ঘুম ভাঙল না, তখন এল শূল, মুসল। এসব অস্ত্র দিয়ে তাকে ক্রমাগত আঘাত দেওয়া চলতে লাগল, বড় বড় গাছ, পাহাড়ের চূড়া দেহের ওপর ফেলে দেওয়া হ'ল! কিন্তু তবুও কুম্ভকর্ণের ঘুমের ব্যাঘাত হ'ল না।

তবে এমন অত্যাচারের মধ্যে কেই বা আর ঘুমতে পারে! শেষ পর্যন্ত কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙল। তুলল এক বিরাট হাই, রাক্ষসরা ভয় পেয়ে সরে দাঁড়াল।

অকালে কুম্ভকর্ণের হ'ল জাগরণ! রাবণের আদেশে মহাকায় কুম্ভকর্ণ এল যুদ্ধে। রামচন্দ্র তাকে নিহত করলেন। ক্রমে ক্রমে নিহত হ'ল সেনাপতি ত্রিশিরা, নরান্তিক, অতিকায় প্রভৃতি রাক্ষস সেনাপতিগণ। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করলেন লক্ষ্মণ। এর পর একে একে নিহত হ'ল রাবণের অন্যান্য বংশধরগণ। এবার আরম্ভ হ'ল রাম-রাবণের যুদ্ধ। রামচন্দ্র অনায়াসেই রাবণকে বধ করলেন।

সরমা সীতাকে যুদ্ধের শেষ সংবাদ দিয়ে বললেন, সতি, দুরাত্মা রাবণ পাপের ফল ভোগ করেছে। তার বংশে আর কেউ বেঁচে রইল না। সতী স্ত্রীর অপমানে রাক্ষসকুল সমূলে ধ্বংস হয়ে গেল। লঙ্কা ছারখার হ'ল। সখি, এবার তুমি মিলিত হবে স্বামীর সঙ্গে।

সীতা সরমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, সখী সরমা, লঙ্কায় আমি যে অপমান সহ্য করেছি, তা আমি জীবনেও ভুলতে পারব না। সেই সঙ্গে তোমার স্নেহ-ভালবাসার কথাও আমার চিরদিন মনে থাকবে। আমার জীবনের অন্ধকারে তুমি ছিলে আলো, তৃষ্ণায় তুমি ছিলে জল, শোকে সান্ত্বনা।

দুঃখের দিনে চোখে আসে জল। আনন্দেও মানুষের চোখে জল পড়ে। গভীর আনন্দে সীতার চোখেও জল এল। চোখের জল তাঁর গাল বেয়ে পড়তে লাগল।

অভিশপ্ত হনুমান

রাবণ-বধের পর সীতাকে উদ্ধার করে রামচন্দ্র ফিরে এসেছেন অযোধ্যায়। বসেছেন অযোধ্যার সিংহাসনে। সঙ্গে এসেছেন হনুমান, বিভীষণ, সুগ্রীব আর বানর সেনাপতিগণ।

রাজসভায় বসে আছেন রামচন্দ্র। এমন সময় একদিন মহর্ষি অগস্ত্য এলেন রাজসভায়। রামচন্দ্র তাঁকে প্রণাম করলেন মহর্ষি তাঁর আসনে বসলেন। তারপর রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করে বললেন, রামচন্দ্র, আমি তোমাকে আমার অভিনন্দন জানাতে এসেছি। তোমার কুশল হোক।

তারপর নানাবিধ আলোচনা আরম্ভ হ'ল। রামচন্দ্র বললে, মহর্ষি, আমার একটা প্রশ্ন আছে। আশা করি, আপনি এর উত্তর দিতে পারবেন।

মহর্ষি অগস্ত্য উত্তর দিলেন, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

রামচন্দ্র বললেন, আমি বালী বধ করেছি, লঙ্কা জয় করেছি, কিন্তু আমি জানি হনুমানের শক্তি। সে একাই বালী বধ করতে পারত, জয় করতে পারত লঙ্কা। অথচ সে তা করেনি। বালী সুগ্রীবকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। অথচ শক্তি থাকতেও হনুমান তার প্রতিবিধান করেনি। একদিনেই সে লঙ্কা জয় করতে পারত। তা না করে আমার আদেশ-মত

কাজ করেছে। আমাকে সাহায্য করেছে। অদ্ভুত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। হনুমান নিজের শক্তির ব্যবহার করেনি কেন?

মহর্ষি অগস্ত্য উত্তর দিলেন রামচন্দ্র তুমি যে প্রশ্ন করেছ, তার উত্তর আমি দিচ্ছি। হনুমানের জীবনের অদ্ভুত কথা শুনলেও বিশ্বাস হবে না। তবুও তা সত্য।

পবনের ছেলে হনুমান। হনুমানের মায়ের নাম অঞ্জনা। হনুমানের জন্ম হবার পর তার মা অঞ্জনা হ'ল ক্ষুধায় কাতর। ছেলেকে রেখে সে বনে বনে আহারের খোঁজে বেড়াতে লাগল। এদিকে হনুমানেরও ক্ষুধা পেয়েছে। মা কাছে নেই। তখন সকাল বেলা। সবেমাত্র লালবর্ণ গোলাকার সূর্য উঠেছে পূর্ব আকাশে। হনুমান ভাবল, এটি বোধ হয় একটি ফল। সে লাফ দিয়ে উঠল আকাশের সূর্যকে ধরবার জন্যে। দেব, দানব, গন্ধর্ব, সিদ্ধরা অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল আকাশের দিকে। যে বেগে সে উঠেছে, সে বেগ পৃথিবীতে আর কারো নেই—নেই বাতাসের বা গরুড়ের।

সূর্যের কাছে গেলেই হনুমান পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। ছেলের জন্য ভয় পেলেন পবনদেব। সূর্যের তেজ থেকে বাঁচাবার জন্য তিনি শীতল হয়ে বইতে লাগলেন। সূর্যও নিজের তেজ কমিয়ে নিলেন। বুঝলেন, কালে শিশু হনুমান হবে মস্ত বীর।

সেদিন অমাবস্যা। রাহু আসছিল সূর্যকে গ্রাস করতে। রাহুর তো দেহ নেই। শুধু একটা মাথা। হনুমান মনে করল এও একটা ফল। সূর্যকে ছেড়ে দিয়ে সে এবারে আক্রমণ করল

রাহুকে। রাহু ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়ে উপস্থিত হ'ল সুররাজ ইন্দ্রের কাছে, বললে, ইন্দ্র, তোমার কথার কোন মূল্য নেই। সমুদ্রমন্থনের সময় আমি গোপনে অমৃত খেয়েছিলাম। চন্দ্র-সূর্য তা দেখতে পেয়ে বিষ্ণুকে বলে দেয়। বিষ্ণু আমায় দু'খানা করে কেটে ফেলে। অমৃত খেয়েছিলাম বলে আমি মরি নি। তুমি বলেছিলে চন্দ্রসূর্য হবে আমার খাদ্য। কিন্তু এখন দেখছি সূর্য অপরেরও খাদ্য।

সুররাজ রাহুর কথা শুনে অবাক্ হলেন। তিনি ঐরাবত হাতীতে চড়ে এলেন সূর্যের কাছে। ঐরাবতের গলায় ছিল সোনার ঘণ্টা? ঘণ্টার শব্দে ফিরে তাকাল হনুমান। দেখল, একটা বিরাট সচল পাহাড় এগিয়ে আসছে তার দিকে। তার মনে হ'ল, এও সুন্দর খাবার জিনিস। সে ঐরাবতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সুররাজ বিপদে পড়লেন। তাঁর রাগও হ'ল খুব। তিনি বজ্র দিয়ে হনুমানকে আঘাত করলেন। এই আঘাতে হনুমানের বাঁদিকের চোয়াল (হনু) ভেঙ্গে গেল। অজ্ঞান হয়ে সে একটা পাহাড়ের ওপর পড়ে গেল।

খবর পেলেন পবনদেব। ইন্দ্রের ওপর তাঁর হ'ল রাগ। তিনি ছেলেকে বুকে করে সেই পাহাড়ের গুহায় স্থির হয়ে বসে রইলেন।

তিনভুবনের বায়ু বন্ধ হয়ে গেল। প্রাণীদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। কেউ কোন কাজ করতে পারে না। যাগ-যজ্ঞ

সব লোপ পেল। তিনভুবন নরক হয়ে উঠল। দেবতারা গেলেন প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে, বললেন, পিতামহ, রক্ষা করুন। আপনার সৃষ্টি যায়-যায়। আপনিই পবনকে করেছেন জীবনের অধিপতি। পবনদেব চুপ করে বসে আছেন। প্রাণীদের কষ্টের আর শেষ নেই।

পিতামহ উত্তর দিলেন, দেবগণ, চল, আমরা পবনের কাছে যাই। তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করি।

দেবগণ সহ ব্রহ্মা এলেন পাহাড়ের গুহায়। সেখানে ছেলে কোলে করে বসেছিলেন পবনদেব। পিতামহ ব্রহ্মাকে দেখামাত্র উঠে দাঁড়ালেন পবনদেব, তাঁকে করলেন প্রণাম। জানালেন ছেলের বজ্রাঘাতের কথা।

পিতামহ সস্নেহে হনুমানের দেহে হাত বুলিয়ে দিলেন। হনুমান নিশ্বাস ফেলে উঠে বসল। ছেলেকে সজীব দেখে পবনদেব আনন্দিত হলেন। নিজের প্রবাহ করলেন মুক্ত। আবার তিনভুবনে বাতাস বইতে লাগল, প্রাণীরা মরণের হাত থেকে বেঁচে উঠল। পাখীরা আবার গাছে গাছে নেচে বেড়াতে লাগল, পশুরা আবার বনে বনে ঘুরতে লাগল। তিনভুবনে উঠল আনন্দের কোলাহল।

পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকে সম্বোধন করে বললেন, দেবগণ, হনুমান পৃথিবীতে বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছে। তোমরা একে সকলে একে একে বর দাও।

বর দেবার জন্য প্রথমে এলেন ইন্দ্র। তিনি নিজের গলার

১। হনুমান, তোমার যে বল আছে, তা তুমি জানতে পারবে না।

২। সেইজন্যেই সুগ্রীবের সখা হয়েও সে বালীকে বধ করেনি।

৩। রামচন্দ্র যখন হনুমানকে তাঁর অসাধারণ বলের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন, তখনই সে সাগর লঙ্ঘন করেছিল।

৪। সীতাদেবী মহাবলশালী বলে উত্তেজিত করায় হনুমান লঙ্কা পুড়িয়ে দিয়েছিল।

পদ্মের মালা হনুমানের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, আমি এই শিশুর হনু ভেঙ্গে দিয়েছি। তাই এই শিশু পৃথিবীতে 'হনুমান' নামে হবে বিখ্যাত। আর, আমি বর দিচ্ছি, আমার বজ্র একে বধ করতে পারবে না।

সূর্য বর দিলেন, আমার তেজের শতভাগের একভাগ একে দিলাম।

বরুণ বর দিলেন, জলে এর মৃত্যু হবে না।

যম বর দিলেন, আমার দণ্ডে এর মৃত্যু হবে না। যুদ্ধে কখনো এ মুষড়ে পড়বে না। কোন কালে এর কোন রোগ হবে না।

কুবের বর দিলেন, আমার গদায় এর মৃত্যু হবে না।

মহাদেব বর দিলেন, আমা হতে এর মৃত্যুভয় থাকবে না।

পিতামহ বর দিলেন, ব্রহ্মাস্ত্রে বা ব্রহ্মশাপে এর মৃত্যু হবে না। শিশু বড় হয়ে হবে মহাবীর।

বিশ্বকর্মা বর দিলেন, আমি দেবতাদের জন্য যে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করেছি, তাতে হনুমানের মৃত্যু হবে না।

দেবতাদের বরে হনুমানের রইল না মরণের ভয়, পরাজয়ের ভয়। ক্রমে তার বয়স বাড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে উপদ্রবও বাড়তে লাগল। মুনি-ঋষিদের আশ্রমেই তার উৎপাত বেশি। মুনি-ঋষিরা যজ্ঞ করছেন। হঠাৎ সে এসে গেল। ভেঙ্গে দিল সে যজ্ঞের বেদি, নিবিয়ে দিল যজ্ঞের আগুন, ঘিয়ের পাত্র উল্টে দিল, দধি, দুধ, অন্ন প্রভৃতি দিল চারদিকে ছড়িয়ে।

প্রতিদিন এই উৎপাত। দেবতারা জানেন ব্রহ্মার বরের কথা। ব্রহ্মার বরে হনুমানকে কোন শাস্তি দেওয়া যাবে না। সুতরাং তাঁরা এই উৎপাত প্রতিদিন মুখ বুঁজে সহ্য করেন। কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। একদিন আবার মুনিগণের আশ্রমে উপদ্রব আরম্ভ করেছে হনুমান। মুনিরা এবার রেগে গিয়ে শাপ দিলেন—দেবতাদের বরে তুমি যে শক্তি লাভ করেছ, প্রতিদিন তুমি তাতে মেতে উঠেছ। বলের অন্যায় প্রয়োগ ভাল নয়। তাই আমরা তোমাকে শাপ দিচ্ছি, তোমার যে বল আছে, তা তুমি জানতে পারবে না। কেউ যদি তোমাকে উত্তেজিত ক'রে তোমার বলের কথা মনে করিয়ে দেয়, তা হলেই তুমি নিজের শক্তি-সম্বন্ধে হবে সচেতন।

মুনিদের এই শাপে হনুমান শান্ত হয়ে গেল। তার উপদ্রব কমে গেল। নিজের অসীম বলের কথা যেন সে ভুলেই গেল।

রামচন্দ্র, এইজন্যই সুগ্রীবের সখা হয়েও সে বালীকে বধ করেনি। কারণ, বালী-বধ করতে তাকে কেউ উত্তেজিত করেনি। কেউ তার বলের কথা তাকে মনে করিয়ে দেয়নি। তুমি যখন সীতার সংবাদ জানবার জন্য হনুমানের অসাধারণ বলের কথা জানিয়ে দিয়েছিলে, সে তখনই লাফিয়ে সাগর পার হয়েছিল। সীতাদেবী যখন তাকে মহাবলশালী বলে উত্তেজিত করেছিলেন, তখনি সে লঙ্কা পুড়িয়ে ছাড়খাড় করেছিল। একমাত্র হনুমান ভিন্ন কারো পক্ষে তা সম্ভব ছিল না।

রামায়ণ-গান

রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ হ'ল।

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে বললেন, মহারাজ, আমার একটি কথা বলবার আছে।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, বল।

লক্ষ্মণ বলতে লাগলেন, মহারাজ, প্রজাদের খুশি করবার জন্য আপনি দেবী সীতাকে বনবাসে পাঠিয়েছেন। তাই আজ সোনার সীতা গড়িয়ে আপনাকে যজ্ঞ শেষ করতে হয়েছে। দেবীর কোন সংবাদ আমরা আর জানি না।

রামচন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না, চুপ করে বসে রইলেন। সতী সীতার কথা তাঁর সব সময় মনে পড়ে। এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেন না। রঘুকুলের লক্ষ্মী, সতীসাধ্বী সীতা। তাঁর অদৃষ্টে এত দুঃখও লেখা ছিল!

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন রামচন্দ্র। মনে ভাবলেন, সীতার দুঃখের বুঝি আর শেষ নেই। দীর্ঘ দিন বনবাসের কষ্ট, রাবণের নানা অত্যাচার সহ্য করে তিনি ফিরে এলেন অযোধ্যায়। হলেন অযোধ্যার রানী। এল সুখের দিন।

কিন্তু কিসে কি হয়ে গেল? সীতাকে পাঠাতে হ'ল আবার বনবাসে!

রামচন্দ্রের চোখে জল এল।

লক্ষ্মণ বললেন, মহারাজ, দেবী সীতার অভাবে আপনিই একা কষ্ট পাচ্ছেন, তা নয়। অযোধ্যার কারো মনে আনন্দ নেই। রাজপুরী অন্ধকার, অন্ধকার সমস্ত অযোধ্যা।

এবার রামচন্দ্র উত্তর দিলেন, লক্ষ্মণ, তোমাদের সকলের মনের কথা জানি। কিন্তু জেনেও সীতাকে ফিরিয়ে আনবার কোন উপায় নেই। তিনি বেঁচে আছেন কিনা, তাও কেউ জানে না।

লক্ষ্মণ বিনীতভাবে বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশ আমি চিরদিন মাথা পেতে নিয়েছি। কোনদিন কোন প্রশ্ন করিনি। কারণ, আমি জানি, আপনি যে কাজ করেন, তাতে আছে ধর্মের অনুমোদন। আপনি যে পথে চলেন, তা ন্যায়ের পথ, সত্যের পথ। কিন্তু প্রজারা দেবীকে যে অপবাদ দিয়েছিল, তা যে মিথ্যা, এ কথা আপনার চেয়ে আর কেউ বেশী জানে না।

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন, লক্ষ্মণ, তুমি যা বলেছ, তা ঠিক। কিন্তু আমার কিছু বলবার নেই।

লক্ষ্মণ বললেন, মহারাজ, সীতাদেবীর সম্বন্ধে কোন কথা বলতে আমি আসি নি। যখন আমি ও সুমন্ত্র তাঁকে তপোবনে রেখে আসি, তখন তিনি ছিলেন গর্ভবতী। তাঁর সন্তানের খবর রাখাও কি আমাদের উচিত নয়?

গভীর বেদনায় রামচন্দ্রের মন আবার আচ্ছন্ন হ'ল। কিন্তু তিনি কোন কথা বললেন না, চুপ করে বসে রইলেন।

এমন সময় এলেন কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠ। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ তাঁকে প্রণাম করলেন। মহর্ষি আসনে বসে বললেন, রামচন্দ্র, তোমার যজ্ঞ শেষ হয়েছে। এমন যজ্ঞ পৃথিবীতে আর হয় নি। যাঁরা অতিথি হয়ে এখানে এসেছেন, তাঁরা প্রচুর দান আর সম্মান পেয়ে খুব সন্তুষ্ট। এখানে অনেক দীর্ঘজীবী মুনিও এসেছেন। তাঁরা বললেন, এ পর্যন্ত কোন দিন কোন যজ্ঞে এত দান কেউ করেন নি। তোমার এই অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা সমস্ত পৃথিবীর লোক চিরকাল মনে রাখবে। আজ আমি একটি বিশেষ কাজে তোমার কাছে এসেছি।

রামচন্দ্র বললেন, অনুমতি করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ বললেন, রামচন্দ্র, মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে এসেছেন যজ্ঞে। তোমার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে লিখেছেন এক অপূর্ব মহাকাব্য। মহর্ষির শিষ্যদের মধ্যে আছে দু'টি কিশোর বালক। তারা বীণাযন্ত্রের সঙ্গে গাইছে রামায়ণ-গান। মুগ্ধ হয়ে সে গান শুনেছেন যজ্ঞস্থলের অতিথি-অভ্যাগতের দল। তোমার ইচ্ছা হলে রামায়ণ-গান শুনতে পার। মহর্ষি আগামী কাল আবার নিজের আশ্রমে চলে যাবেন।

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন, গুরুদেব, আমি শুনব।

পরদিন প্রভাত হ'ল। যজ্ঞস্থলে এলেন অতিথি-অভ্যাগতের দল। যজ্ঞসভার মাঝখানে বসলেন রামচন্দ্র। তাঁর পাশে লক্ষ্মণ, ভরত আর শত্রুঘ্ন।

মহর্ষি বাল্মীকি তার দুই শিষ্য কুশ ও লবকে নিয়ে প্রবেশ করলেন সভায়। অপরূপ সুন্দর দুই কিশোর। পরনে গাছের বাকল, মাথায় জটা, হাতে বীণা।

সভায় উঠল মৃদু গুঞ্জন। দু'জন মুনিবালক কিশোর বয়সের যেন দুই রামচন্দ্র…সেই চোখ, সেই মুখ, সেই নতুন দুর্বার মত গায়ের রং!

রামচন্দ্র একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন মুনিকুমার দু'টিকে।

ততক্ষণে উঠেছে বীণার ঝঙ্কার, আরম্ভ হয়েছে গান। সভা স্তব্ধ। শ্রোতারা মুগ্ধ। এমন মধুর গান তারা জীবনে শোনে নি।

গান শেষ হ'ল। রামচন্দ্র কুশ-লবকে ডাকলেন। তারা এসে দাঁড়াল অযোধ্যার রাজার কাছে।

রামচন্দ্র প্রশ্ন করলেন, তোমাদের পরিচয় কি?

কুশ উত্তর দিল, মহারাজ, আমরা দু' ভাই। মহর্ষির শিষ্য। জন্ম থেকে আশ্রমে পালিত। এর বেশী আর কিছু জানি না।

রামচন্দ্র বললেন, ঋষিকুমার আমি তোমাদের গান শুনে বড় খুশি হয়েছি। আঠার হাজার সোনার টাকা আমি তোমাদের দান করছি। তোমরা নাও। তোমাদের আর কোন প্রার্থনা থাকলে জানাতে পার।

কুশ উত্তর দিল, মহারাজ, আমরা আশ্রমে থাকি। ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করি। আমাদের অর্থের তো কোন প্রয়োজন

নেই। আপনার কাছে কোন প্রার্থনাও আমাদের নেই। গুরুর আদেশে আমরা গান শোনাই। গান গেয়েই আমাদের আনন্দ। তার বদলে আমরা কিছুই চাই না।

রামচন্দ্র প্রশ্ন করলেন, মহর্ষি বাল্মীকি এখন কোথায়?

কুশ উত্তর দিল, তিনি যজ্ঞস্থলের কুটীরেই আছেন।

রাম লক্ষ্মণকে বললেন, চল লক্ষ্মণ, আমরা মহর্ষির কুটীরে যাই। কিশোর দুটির পরিচয় জানবার জন্য আমার মন বড় অস্থির হয়ে উঠেছে।

পরিচয় জানবার জন্য লক্ষ্মণের আগ্রহও কম নয়। তাঁর বিশ্বাস, কুশ-লব সীতারই সন্তান। ঠিক রামেরই মত দেখতে। গায়ে বাকল আর মাথায় জটা না থাকলে রামচন্দ্রের সঙ্গে এদের প্রভেদ ধরা যেত না।

রাম-লক্ষ্মণ এলেন মহর্ষি বাল্মীকির কুটীরে। করলেন মহর্ষিকে প্রণাম। মহর্ষি আশীর্বাদ করলেন। রামচন্দ্র বিনীত-ভাবে বললেন, মহর্ষি আপনার দু'টি শিষ্যের রামায়ণ-গান আজ শুনেছি। অপূর্ব এদের কণ্ঠস্বর। সুন্দর চেহারা। বনে হয় যেন দেব-বালক। দয়া করে এদের পরিচয় আপনি আমাকে জানান। আমার মন বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

মহর্ষি উত্তর দিলেন, রামচন্দ্র, এতদিন তোমার কাছে যে কথা আমি গোপন করে রেখেছি, আজ তা জানাবার সুযোগ এসেছে।

সীতাকে আমার আশ্রমের কাছে লক্ষ্মণ আর সারথি সুমন্ত্র রেখে গেলেন। আমি মুনিকুমারদের কাছে শুনলাম, লক্ষ্মীর মত সুন্দরী এক নারী একা বনে বসে কাঁদছেন। আমি বুঝতে পারলাম ইনিই সীতা। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, মা সীতা, আমি তপোবলে সব জানতে পেরেছি। তুমি মহারাজ দশরথের ছেলের বউ, রামের প্রিয় স্ত্রী, রাজর্ষি জনকের মেয়ে। তুমি নিষ্পাপ। তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমার নাম বাল্মীকি। আমার আশ্রমের কাছেই থাকেন তাপসীরা। তাঁরা তোমাকে মেয়ের মত পালন করবেন। তুমি আমার সঙ্গে এস। আজ থেকে আমার আশ্রমই হবে তোমার নতুন আশ্রয়।

সীতা এলেন আমার আশ্রমে। যথাকালে তাঁর দুটি যমজ পুত্র জন্মাল। প্রথমে যে পুত্র হয়, তাকে মন্ত্রপড়া কুশের গোড়া দিয়ে মাজা হ'ল। আমি তার নাম রাখলাম কুশ। শেষে যে পুত্র হ'ল তাকে মাজা হ'ল সেই কুশের ডগা দিয়ে। তাই তার নাম হ'ল লব। রামচন্দ্র কুশ ও লব তোমারই পুত্র। আমি এতদিন এদের পালন করেছি, এবার তুমি তোমার পুত্রদের গ্রহণ কর। আমার কর্তব্য শেষ হ'ল।

রামচন্দ্র কুশ ও লবকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যজ্ঞসভায়। সবাই এসে রামচন্দ্রকে ঘিরে দাঁড়াল। চারদিকে উঠল আনন্দের কলরব।

রামচন্দ্র এবার মহর্ষিকে বললেন, মহর্ষি, আমি আবার

সীতাকে গ্রহণ করতে চাই। কিন্তু একটা কথা নিবেদন করবার আছে।

মহর্ষি হাসিমুখে বললেন, বল, কি বলতে চাও।

রামচন্দ্র বললেন, আমি একদিন প্রজাদের নিন্দার ভয়ে সীতাকে ত্যাগ করেছিলাম। তিনি একবার নিজেকে নিষ্পাপ প্রমাণ করবার জন্য লঙ্কায় অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছিলেন। প্রজাদের মনের সন্দেহ দূর করবার জন্য সকলের কাছে আবার তাঁকে অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হবে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে প্রজাদের আর কিছু বলবার থাকবে না।

মহর্ষি উত্তর দিলেন, বেশ তাই হবে। পতিই নারীর দেবতা। তোমার যা ইচ্ছা, সীতা তাই করবেন। আগামী কাল প্রভাতেই এই পরীক্ষা হবে।

পরদিন প্রভাত হ'ল। যজ্ঞস্থলে এলেন রাজগণ, মুনিগণ! এল মহাবল রাক্ষস ও বানরের দল, আর এল অযোধ্যার প্রজারা। এমন সময় সেখানে সীতাকে নিয়ে এলেন মহর্ষি বাল্মীকি। সভায় সকলে সীতার জয়ধ্বনি করে উঠল।

মহর্ষি বাল্মীকি সভায় দাঁড়িয়ে যললেন, কুশ ও লব সীতার যমজ পুত্র। লোকনিন্দার ভয়ে রামচন্দ্র গর্ভবতী সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন। আমার আশ্রমেই কুশ-লবের জন্ম। আমি জানি সীতা পরিব্রতা। তবুও সকলের সন্দেহ দুর করবার জন্য ইনি আবার অগ্নি-পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত। আমি বহু বছর তপস্যা করেছি। সীতা যদি দোষযুক্তা হন, তবে সেই

১। মহর্ষি বাল্মীকি বললেন, রামচন্দ্র, যে কথা আমি গোপন করে রেখেছি, আজ তা জানাবার সুযোগ এসেছে।

২। লব-কুশকে পুত্র জেনে রামচন্দ্র তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

৩। পরদিন সীতাকে নিয়ে সভাস্থলে উপস্থিত হলেন মহর্ষি বাল্মীকি।

৪। সীতা শপথ করছেন, এমন সময় দেবী পৃথিবী দু'হাত সীতার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

তপস্যার ফল যেন আমি ভোগ না করি। রামচন্দ্র, সীতা সতী জেনেও তুমি তাকে ত্যাগ করেছ।

রামচন্দ্র বললেন, মহর্ষি, আমি জানি, সীতা নিষ্পাপ। তবুও লোকনিন্দার ভয়ে আমি তাঁকে ত্যাগ করেছিলাম। তাঁকে পুনরায় গ্রহণ করতে আমার কোন অনিচ্ছা নেই।

এবার সীতা হাত জোড় করে বললেন,

যদি রাঘব ভিন্ন অন্য কাউকে মনে মনেও চিন্তা না করে থাকি, তবে পৃথিবী দ্বিধা হয়ে আমাকে আশ্রয় দিন।

রাম ভিন্ন আর কাউকে জানি না, এই যদি সত্যি হয়, পৃথিবী দ্বিধা হয়ে আমাকে আশ্রয় দিন।

যদি মনে, কাজে, বাক্যে রামকে পূজা করে থাকি, তবে পৃথিবী দ্বিধা হয়ে আমাকে আশ্রয় দিন।

ব্যাকুল হয়ে সীতা শপথ করেছেন, এমন সময় পৃথিবী দুলে উঠল। যজ্ঞভূমি ফেটে দু'ভাগ হয়ে গেল। উঠে এল এক রত্নসিংহাসন। সিংহাসনে বসে আছেন দেবী পৃথিবী। তিনি তাঁর দু'হাত সীতার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। সীতা তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সিংহাসন ধীরে ধীরে নীচে নামতে লাগল। আকাশ থেকে হ'ল পুষ্পবৃষ্টি। যজ্ঞশালায় সীতার নামে উঠল জয়ধ্বনি। সীতাকে নিয়ে চলে গেল রত্নসিংহাসন পাতালে।

মহাপ্রস্থান

সীতার পাতালপ্রবেশের পর রামচন্দ্রের মনে আর শান্তি রইল না। তবুও তিনি রাজকাজ করে যেতে লাগলেন। কয়েকদিন দিন পরে কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রার মৃত্যু হ'ল। রামচন্দ্র এবার ভরত, শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণের পুত্রদের বিভিন্ন দেশের রাজপদে বসালেন। লক্ষ্মণ যথারীতি রামচন্দ্রের সেবা করতে লাগলেন।

একদিন রাজদ্বারে দাঁড়িয়েছিলেন লক্ষ্মণ। এমন সময় এলেন এক ঋষি। তিনি লক্ষ্মণকে বললেন, লক্ষ্মণ, আমার সময় বড় কম। বেশিক্ষণ রাজদ্বারে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তুমি এই মুহূর্তে রামচন্দ্রকে জানাও—একজন তপস্বী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।

লক্ষ্মণ প্রশ্ন করলেন, আপনার প্রয়োজন জানতে পারি কি ?

ঋষি উত্তর দিলেন, আমার আসার কারণ আমি রাজা রামচন্দ্রকেই জানাব। অন্য কাউকেও সে কথা বলা যাবে না। তুমি তাড়াতাড়ি কর।

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের কাছে এসে বললেন, এক ঋষি আপনার সঙ্গে এই মুহূর্তে দেখা করতে চান। তার সাক্ষাতের কারণ আমাকে জানাগেন না।

রামচন্দ্র ঋষিকে রাজসভায় নিয়ে আসার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন।

রাজসভায় এলেন ঋষি। সিংহাসন থেকে নেমে এসে রামচন্দ্র তাঁদের প্রণাম করলেন। ঋষি রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করে বললেন, মহারাজ, আপনার কুশল হোক।

রামচন্দ্র প্রশ্ন করলেন, আপনার আসার কারণ কি?

ঋষি উত্তর দিলেন, সে কথা আমি সকলের কাছে বলতে পারি না। আমি গোপনে বলতে চাই। আর একটা প্রতিজ্ঞা আপনাকে করতে হবে।

—কি প্রতিজ্ঞা?

—আমাদের গোপন-কথা কেউ শুনতে পাবে না। যদি কেউ শোনে, তবে তাকে ত্যাগ করতে হবে।

—বেশ, আমি প্রতিজ্ঞা করলাম।

রামচন্দ্র এবার লক্ষ্মণকে বললেন, লক্ষ্মণ, তুমি রাজদ্বারে গিয়ে অপেক্ষা কর। কেউ যেন এখানে না আসে। যে আমাদের কথা শুনবে, তাকে আমি ত্যাগ করব।

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে প্রণাম করে আবার দ্বারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

এবার রামচন্দ্র ঋষিকে বললেন, মুনিবর, আপনার আসার উদ্দেশ্য এবার আমাকে বলুন।

ঋষি উত্তর দিলেন, মহারাজ, পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আমি কাল। আপনি যে কাজের জন্য মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, সে-কাজ শেষ হয়েছে। এবার দেবলোকে ফিরে যাবার সময় হয়েছে। দেবগণ বিষ্ণুকে আবার স্বর্গে ফিরে পেতে চান।

রামচন্দ্র হেসে বললেন, কাল, তুমি ঠিক সময়েই এসেছ। এবার আমার স্বর্গে যাবার সময় হয়ে এসেছে। পিতামহ ব্রহ্মা আমার ওপর যে ভার দিয়েছিলেন, আমি তাহা বহন করেছি। পৃথিবীতে এখন ধর্মরাজ্য স্থাপিত হয়েছে।

রামচন্দ্র ও কাল কথাবার্তা বলছেন, এমন সময়ে রাজদ্বারে এলেন ঋষি দুর্বাসা। বললেন, লক্ষ্মণ, আমি এখুনি রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে চাই। দেরী হলে আমার চলবে না।

লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন, মহারাজ এখন বিশেষ গোপন কাজে ব্যস্ত। আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে।

রেগে গেলেন মহর্ষি দুর্বাসা। তাঁর চোখ দুটো জ্বলে উঠল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন, লক্ষ্মণ, তুমি এই মুহূর্তে আমার কথা রামচন্দ্রকে জানাও। যদি না জানাও, তা হলে অযোধ্যার প্রতি, রামচন্দ্রের প্রতি, ভরতেব প্রতি, তোমার প্রতি, শত্রুঘ্নের প্রতি, এমন কি তোমাদের ছেলেমেয়েদের প্রতি আমি শাপ দেব। তুমি জান, আমি রাগ দমন করতে পারি না।

বিপদে পড়লেন, লক্ষ্মণ। তিনি এখন কি করবেন ? এক দিকে রামচন্দ্রের আদেশ, অন্য দিকে দুর্বাসার শাপ। তিনি ঠিক করলেন. তিনি যাবেন রামচন্দ্রের কাছে। এতে ~~হয়ত~~ তাঁর প্রাণদণ্ড হবে, কিন্তু দুর্বাসার শাপ থেকে রক্ষা পাবে সকলে।

লক্ষ্মণ দ্বার ছেড়ে চললেন রামচন্দ্রের কাছে। রামচন্দ্র ও কালের কথাবার্তা তাঁর কানে গেল।

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে বললেন, মহারাজ, মহর্ষি দুর্বাসা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। অপেক্ষা করতে পারবেন না।

রামচন্দ্র কালকে বিদায় দিয়ে দুর্বাসাকে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিলেন। লক্ষ্মণ দুর্বাসাকে রামচন্দ্রের কাছে নিয়ে এলেন। রামচন্দ্র মহর্ষিকে প্রণাম করে প্রশ্ন কর[illegible] কি প্রয়োজন বলুন?

মহর্ষি উত্তর দিলেন, মহারাজ, আজ আমার দীর্ঘকালের তপস্যা শেষ হয়েছে। বহুকাল আমি অনাহারে আছি। আমার ভোজনের আয়োজন করুন।

রামচন্দ্র তখনি মহর্ষির ভোজনের আয়োজন করলেন। মহা আনন্দে আহার শেষ করে রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করে মহর্ষি দুর্বাসা নিজের আশ্রমে চলে গেলেন। রামচন্দ্র দুঃখিত মনে চুপ করে বসে রইলেন।

রামচন্দ্রের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে লক্ষ্মণ বললেন, মহারাজ, আপনার দুঃখের কোন কারণ নেই। আমি আপনার আদেশ রাখতে পারি নি। এবার আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন। আমাকে ত্যাগ করুন।

রামচন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না। [illegible] পাঠালেন, ডেকে[illegible] তিনি তাঁদের জানালেন [illegible] নিজের কর্তব্য-সম্বন্ধে তাঁদের কাছে উ[illegible]লেন।

কুলগুরু বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন, মহারাজ, কালই বলবান। লক্ষ্মণকে ত্যাগ করে তোমার প্রতিজ্ঞা রাখতে হবে। একমাত্র তোমার পক্ষেই এমন কঠিন কাজ করা সম্ভব। রাজা যদি নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন, তা হলে জগতে ধর্ম লোপ পাবে, জগৎ ধ্বংস হবে।

সভায় আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা চুপ করে বসে রইলেন। সভায় পড়ল শোকের ছায়া। মহর্ষি বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের দিকে চেয়ে আবার বললেন, মহারাজ, ধর্মপালনের জন্য, মহারাজ দশরথের প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য তুমি বনবাসে গিয়েছিলে। তুমি বনে যাবার পর সাধু মহারাজ দশরথ শোকে প্রাণত্যাগ করেন। কাল বলবান। কালের গতি তোমাকে মানতে হবে। তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর। লক্ষ্মণকে ত্যাগ কর।

মহর্ষির কথা শুনে রামচন্দ্রের দুটি চোখ জলে ভরে গেল। তিনি সিংহাসন থেকে নেমে এলেন, জড়িয়ে ধরলেন লক্ষ্মণের দুটি হাত। পরে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, লক্ষ্মণ, আমি তোমাকে ত্যাগ করলাম।

কোন কথা বললেন না লক্ষ্মণ। তিনি রামচন্দ্রকে প্রণাম করে এলেন সরযূ নদীর তীরে। সরযূ নদীতে স্নান করে তিনি বসলেন যোগাসনে। যোগাসনেই তিনি দেহ ত্যাগ করলেন।

লক্ষ্মণ-বর্জনের পর শোকে কাতর হয়ে পড়লেন রামচন্দ্র। তিনি কুশকে দক্ষিণ কোশল আর লবকে উত্তর কোশল

দান করলেন। ভরতকে অযোধ্যার রাজপদে বসাবার কথা হ'ল। কিন্তু ভরত রাজী হলেন না। এবার রামচন্দ্র মহাপ্রস্থানে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এ খবর শুনে অযোধ্যা-বাসীরা হ'ল শোকে কাতর। রামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হলেন ভরত আর শত্রুঘ্ন।

রামচন্দ্র চললেন সরযূনদীর তীরে। অ[illegible]
সবাই তাঁর পিছু পিছু চলল।

সরযূতীরে এলেন ব্রহ্মা, এল অনেক দিব্য যান।

ব্রহ্মা বললেন, রামচন্দ্র তোমার ভাইদের সঙ্গে এবার বিষ্ণুদেহে প্রবেশ কর। পৃথিবীতে তোমাদের কাজ শেষ হয়েছে।

তাই হ'ল। রামচন্দ্র তাঁর ভাইদের সঙ্গে বিষ্ণুদেহে মিলিয়ে গেলেন। তাঁদের প্রিয় অযোধ্যাবাসী প্রজাগণ—বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কারো আর বেঁচে থাকবার ইচ্ছে রইল না। রামচন্দ্রের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তারা সরযূর জলে করল আত্মবিসর্জন। দিব্য দেহ ধারণ করে তারাও হ'ল স্বর্গবাসী।

অযোধ্যা হ'ল জনশূন্য।